सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

সাহিত্য মালঞ্চ-২

মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য সংকলন

দশম শ্রেণি

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

প্রকাশনা : রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎ, ত্রিপুরা

সাহিত্য মালঞ্চ-২

মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য সংকলন

দশম শ্রেণি

গ্রন্থস্বত্ব : ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৬
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭
পুণর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০২০

প্রকাশক : অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎ (এস সি ই আর টি), ত্রিপুরা

সংকলন ও সম্পাদনা : **শ্রী শংকর বসু**
ড. গীতা দেবনাথ
ড. স্মৃতি চক্রবর্তী
ড. শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়
ড. স্বপন কুমার পোদ্দার
শ্রী নারায়ণ চন্দ্র শর্মা
শ্রী অনাদি চৌধুরী

প্রচ্ছদ ছবি : শ্রী কমল মিত্র

মূল্য : ২০ টাকা

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

ভারতের নাগরিকের মৌলিক অধিকার

(ভারতের সংবিধান, ধারা ১৪-৩০, ৩২ ও ২২৬)

সাম্যের অধিকার :

- আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে;
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারীপুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।
- সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার।
- অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ।
- উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার অধিকার :

- বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার।
- শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার।
- সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার।
- ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার।
- ভারতের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার।
- যে-কোনো জীবিকা, পেশা বা ব্যবসাবাণিজ্য করার অধিকার।
- জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার :

- কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়, বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না।
- চোদ্দো বছরের কমবয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার :

- সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সমান নিরাপত্তা, কাউকে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করা হবে না এবং প্রত্যেকেই ধর্মাচরণের পূর্ণ এবং সমান অধিকার পাবে।
- রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, জাতি বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না।
- ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার :

- ভারতের যে-কোনো নাগরিকের নিজ নিজ ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার অধিকার রয়েছে।
- ধর্ম, জাতি বা ভাষার দরুন কাউকে সরকারি অথবা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।
- প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার :

- মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে — প্রয়োজনে বিশেষ লেখ (Writ) জারি করতে পারবে;

  হেবিয়াস কর্পাস (Habeas Corpus), ম্যান্ডামাস (Mandamus), সারশিয়ো (Certiorari), প্রহিবিশান (Prohibition), ও কুয়ো ওয়ারান্টো (Quo-Warranto)।

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতের সংবিধান, ধারা ৫১এ)

- সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, সাংবিধানিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ।
- মহৎ যেসব আদর্শ স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করেছে তাদের লালন ও অনুসরণ।
- ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি রক্ষা।
- আহ্বান এলে দেশরক্ষা ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা।
- ভাষা-ধর্ম-অঞ্চল-শ্রেণি নির্বিশেষে ভারতের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যচেতনা ও ভ্রাতৃত্ববোধ উদ্‌বোধন।
- দেশের মিশ্র সংস্কৃতির মূল্যবান উত্তরাধিকারের মাহাত্ম্য উপলব্ধি ও সংরক্ষণ।
- অরণ্য, হ্রদ, নদনদী, বন্যজীবনসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাণীজগতের প্রতি সহানুভূতি পোষণ।
- বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতাবাদ, অনুসন্ধান ও সংস্কারের বিকাশ।
- সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা ও হিংসা পরিহার করা।
- জাতি যাতে নিয়ত তার কর্মোদ্যম ও সাফল্যের উচ্চতর স্তরে পৌঁছোতে পারে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রয়াসে উৎকর্ষের সেই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর প্রচেষ্টা।
- পিতা-মাতা / অভিভাবকের দায়িত্ব ৬-১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা করা।

सत्यमेव जयते

মুখবন্ধ

এখন সারা দেশেই বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যপুস্তক জাতীয় পাঠ্যক্রম পরিকাঠামো অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়। বর্তমান বইটি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর সঙ্গে যুক্ত বিদ্যালয়সমূহের দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

ভাষা ও সাহিত্যশিক্ষা শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা তাদের পূর্বসূরিদের বিকাশের ধারা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা তাদের মনে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলায়ও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এই সংকলনের সম্পাদকগণ এই কথা মনে রেখেই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের রচনা থেকে এই সংকলনের গল্প কবিতাসমূহ সংকলিত করেছেন। পরিশ্রমসাধ্য এই কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করে দেওয়ায় তাদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যে লেখক এবং প্রকাশকরা তাদের স্বত্বাধীন লেখা আমাদের সংকলনে ছাপার অনুমতি দিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যাদের অনুমতি এখনও পাইনি আশা করি অচিরেই তাদের অনুমতি পাব।

বইটি মুদ্রণের সব দায়িত্ব হাসিমুখে গ্রহণ করার জন্য আমি ত্রিপুরার 'রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎ'-এর অধিকর্তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বইটির কোনো ত্রুটির কথা জানালে পর্ষৎ কৃতজ্ঞচিত্তে তা সংশোধনের প্রয়াস নেবে।

আগরতলা,
মার্চ, ২০২০

সভাপতি
ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

সূচিপত্র

কবিতা :

বাল্যলীলা	বলরাম দাস	১৩
অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনি *	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর	১৪
রসাল ও স্বর্ণলতিকা	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৭
দ্বিপ্রহর	স্বর্ণকুমারী দেবী	২০
পরিচয় *	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২
ভারত-সংগীত	অতুলপ্রসাদ সেন	২৪
হাট *	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	২৫
এখানে আকাশ নীল *	জীবনানন্দ দাশ	২৭
আজ সৃষ্টি -সুখের উল্লাসে	কাজী নজরুল ইসলাম	২৮
ত্রিরত্ন	কালিদাস রায়	৩১
পাণ্ডুলিপি	বুদ্ধদেব বসু	৩৫
ভয় করলেই ভয়	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৩৭
এই নবান্নে	সুকান্ত ভট্টাচার্য	৩৯
সামান্যই প্রার্থনা *	বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী	৪০

গদ্য :

স্যার আইজাক নিউটন	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৪১
দস্যু-কবলে *	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪৬
কাব্যরচনাচর্চা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫১
নিয়মের রাজত্ব	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৫৪
শুভ উৎসব	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬০

নতুনদা *	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৪
সিংহের দেশ *	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৩
বই কেনা	সৈয়দ মুজতবা আলী	৮২
দেবতামুড়া ও ডম্বুর *	সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা	৮৯
ভারত - সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ	সিরাজ্জুদ্দীন আমেদ	৯১

ছোটোগল্প :

সুভা *	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯৪
বেড়া *	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১০১
ক্যানভাসার	বনফুল	১০৮
সাদা ঘোড়া	রমেশচন্দ্র সেন	১১২
লোডশেডিং	সত্যজিৎ রায়	১১৮
হিজল খালের কান্না	বিমল চৌধুরী	১২৭

বাগ্‌ধারা : নির্বাচিত ৬০-টি * ১৩১

---

* চিহ্নিতকরণগুলি পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত।

বাল্যলীলা

বলরাম দাস

(যোড়শ শতকের কবি)

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করি এ তো সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে,
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙা পায় জানি লাগে,
প্রবোধ না মানে মায়ের মন॥
নিকটে গোধন রেখো, মা বলে শিঙাতে ডেকো,
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈল গোপজাতি গোধন চারণ বৃত্তি,
তেঞি বনে পাঠাইয়া দিব॥
বলরাম দাসের বাণী শুন ওগো নন্দরানি,
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব মোরা জোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়॥

অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনি

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
(১৭১২-১৭৬০)

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার করো বলিয়া ডাকিল পাটনিরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনি।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনি।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কী জানি কে দেবে ফের-ফার॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় করেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড়ো বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোনো গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ-ভরা বিষ।

কেবল আমার সঙ্গো দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে-ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তার ঘরে যাই॥
পাটনি বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড়ো দিবা কীবা বলো।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চলো॥
যাঁর নামে পার করে ভব পারাবার।
ভালো ভাগ্য পাটনি তাঁহারে করে পার॥
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কীবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
পাটনি বলিছে মা গো বৈস ভালো হয়ে।
পায়ে ধরি কী জানি কুম্ভীরে যাবে লয়ে॥
ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুইব বল॥
পাটনি বলিছে মা গো শুনো নিবেদন।
সেঁউতি উপরে রাখো ও রাঙা চরণ॥
পাটনির বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি-উপরে॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতি-উপরে।
তার ইচ্ছা নাহি ইথে কি তপ সঞ্চারে॥

সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে॥
সোনার সেঁউতি দেখি পাটনির ভয়।
এ তো মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥
তটে উত্তরিলা তরি, তারা উত্তরিলা।
পূর্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা॥
সেঁউতি লইয়া কক্ষে চলিলা পাটনি।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি॥
সভয়ে পাটনি কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল॥
হেরো দেখো সেঁউতিতে থুয়েছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহো পরিচয়॥
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার॥
যে দয়া করিলা মোরে এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহো পরিচয়॥
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্লা-অষ্টমীতে॥
এত দিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ি কোন্দলের ত্রাসে॥
ভবানন্দ মজুন্দার-নিবাসে রহিব।
বর মাগো মনোনীত যাহা চাবে দিব॥
প্রণমিয়া পাটনি কহিছে জোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥

রসাল ও স্বর্ণলতিকা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত
(১৮২৪-১৮৭৩)

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে; —
"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে!
নিদারুণ তিনি অতি;
নাহি দয়া তব প্রতি;
তেঁই ক্ষুদ্র-কায়া করি সৃজিলা তোমারে।
মলয় বহিলে, হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো ঢালিয়া;
হিমাদ্রি সদৃশ আমি,
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া!
কালাগ্নির মতো তপ্ত তপন তাপন, —
আমি কি লো ডরাই কখন?
দূরে রাখি গাভি-দলে,
রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ, —
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র পালন!

আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন।
কেহ অন্ন রাঁধি খায়
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়
এ রাজ চরণে।
শীতলিয়া মোর ডরে
সদা আসি সেবা করে
মোর অতিথির হেথা আপনি পবন!
মধু-মাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে!
তুমি কি তা জান না, ললনে?
দেখ মোর ডাল-রাশি,
কত পাখি বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে!
ধন্য মোর জনম সংসারে!
কিন্তু তব দুখ দেখি নিত্য আমি দুখি;
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ, বিধুমুখি!"
"যুদ্ধার্থ গম্ভীরতার বাণী তব পানে!
সুধা-আশে আসে অলি,
দিলে সুধা যায় চলি, —
কে কোথা কবে গো দুখি সখার মিলনে?"
"ক্ষুদ্র-মতি তুমি অতি"
রাগি কহে তরুপতি,
"নাহি কিছু অভিমান? ধিক চন্দ্রাননে!"
নীরবিলা তরুরাজ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে;

আইলেন প্রভঞ্জন,
সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।
আইল খাইতে মেঘ দৈত্যকুল রড়ে;
ঐরাবত পিঠে চড়ি
রাগে দাঁত কড়মড়ি,
ছাড়িলেন বজ্র ইন্দ্র কড় কড় কড়ে!
ঊরু ভাঙি কুরুরাজে বধিলা যেমতি
ভীম যোধপতি;
মহাঘাতে মড়মড়ি
রসাল ভূতলে পড়ি,
হায় বায়ুবলে
হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে!
ঊর্দ্ধশির যদি তুমি কুল মান ধনে;
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে!
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে।।

দ্বিপ্রহর

স্বর্ণকুমারী দেবী

(১৮৫৫-১৯৩২)

নিস্তব্ধ নিঝুম দিক
শ্রান্তিভরে অনিমিখ
        বসন্তের দ্বিপ্রহর বেলা।
রবির অনল কর,
শীতলিতে কলেবর
        সরোবরে করিতেছে খেলা।
নীল নীলিমার গায়,
সাদা মেঘ ভেসে যায়,
        চিল উড়ে পাতার সমান।
চাতক সে ক্ষুদ্র পাখি
সকরুণ কণ্ঠে ডাকি
        মেঘে চায় ডুবাইতে প্রাণ।
মুকুলিত আম্রশাখে,
পল্লবিত তরু থাকে
        কুহু কুহু কোকিল কুহরে।

হিল্লোলিত সরো-কায়া
ঘুমায় গাছের ছায়া
গাভি নামে জলপান করে।
এলোচুলে মেয়েগুলি
কলশ কোমরে তুলি
স্নান করি গৃহে ফিরে যায়।
একটি রাখাল ছেলে
দূরে মাঠে গোরু ফেলে
কুঞ্জবনে বাঁশরি বাজায়।

পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৮৬১-১৯৪১)

একদিন তরিখানা থেমেছিল এই ঘাটে লেগে
বসন্তের নূতন হাওয়ার বেগে।
তোমরা শুধায়েছিলে মোরে ডাকি,
‘পরিচয় কোনো আছে নাকি,
যাবে কোন্‌খানে?’
আমি শুধু বলেছি, ‘কে জানে!’

নদীতে লাগিল দোলা, বাঁধনে পড়িল টান —
একা বসে গাহিলাম যৌবনের বেদনার গান।
সেই গান শুনি
কুসুমিত তরুতলে তরুণতরুণী
তুলিল অশোক —
মোর হাতে দিয়ে তারা কহিল, ‘এ আমাদেরই লোক।’
আর কিছু নয়,
সে মোর প্রথম পরিচয়॥

তার পরে জোয়ারের বেলা
সাঙ্গ হল, সাঙ্গ হল তরঙ্গের খেলা;
কোকিলের ক্লান্ত গানে
বিস্মৃত দিনের কথা অকস্মাৎ যেন মনে আনে;
কনকচাঁপার দল পড়ে ঝুরে,

ভেসে যায় দূরে,
ফাল্গুনের উৎসবরাতির
নিমন্ত্রণলিখনপাঁতির
ছিন্ন অংশ তারা
অর্থহারা ॥
ভাটার গভীর টানে
তরিখানা ভেসে যায় সমুদ্রের পানে।
নূতন কালের নব যাত্রী ছেলেমেয়ে
শুধাইছে দূর হতে চেয়ে,
'সন্ধ্যার তারার দিকে
বহিয়া চলেছে তরণি কে?'
সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
গাহিলাম আরবার,
'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক,
আর কিছু নয় —
এই হোক শেষ পরিচয়।'

ভারত-সংগীত

অতুলপ্রসাদ সেন

(১৮৭১-১৯৩৪)

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নতশির, নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদজ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান — হবে জয়।

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান,
জগজন জানিবে বিস্ময়!
জগজন মানিবে বিস্ময়!

তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন;
ভারতে জনম, পুন আসিবে সুদিন।
ওই দেখো প্রভাত-উদয়,
ওই দেখো প্রভাত-উদয়।

ন্যায় বিরাজিত যাদের করে
বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে —
সত্যের নাহি পরাজয়,
সত্যের নাহি পরাজয়!

হাট

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
(১৮৮০-১৯৫২)

দূরে দূরে গ্রাম দশবারোখানি, মাঝে একখানি হাট,
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ, প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।
বেচা-কেনা সেরে বিকাল বেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায়;
বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়া পুবের মাঠ;
দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে ওঠে দীপ — আঁধারেতে থাকে হাট।

নিশা নামে দূরে শ্রেণিহারা একা ক্লান্ত কাকের পাখে;
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস পার্শ্বে পাকুড়-শাখে।
হাটের দোচালা মুদিল নয়ান
কারো তরে তার নাই আহ্বান;
বাজে বায়ু আসি বিদ্রুপ-বাঁশি জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে;
নির্জন হাটে রাত্রি নামিল একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল চেনা-অচেনার ভিড়ে;
কত-না ছিন্ন চরণচিহ্ন ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে।
মাল-চেনাচিনি, দর-জানাজানি,
কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি;

হানাহানি করে কেউ নিল ভরে, কেউ গেল খালি ফিরে,
দিবসে থাকে না কথার অন্ত চেনা-অচেনার ভিড়ে।

কত কে আসিল, কত বা আসিছে, কত না আসিবে হেথা;
ওপারের লোক নামালে পসরা ছুটে এপারের ক্রেতা।
শিশিরবিমল প্রভাতের ফল
শত হাতে সহি পরখের ছল
বিকাল বেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা
হিসাব নাহি রে — এল আর গেল কত ক্রেতা-বিক্রেতা।

নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা পুরানো হাটের মেলা;
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী, নিত্য নাটের খেলা!
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে,
বাধা নাই ওগো — যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে ঘরে ফিরিবার বেলা।
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে চিরকাল একই খেলা!

এখানে আকাশ নীল

জীবনানন্দ দাশ

(১৮৯৯-১৯৫৪)

এখানে আকাশ নীল — নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম সাদা — রং তার আশ্বিনের আলোর মতন;
আকন্দফুলের কালো ভিমরুল এইখানে করে গুঞ্জরন
রৌদ্রের দুপুর ভরে; — বারবার রোদ তার সুচিক্কণ চুল
কাঁঠাল জামের বুকে নিংড়ায়; — দহে বিলে চঞ্চল আঙুল
বুলায়ে-বুলায়ে ফেরে এইখানে জাম লিচু কাঁঠালের বন,
ধনপতি, শ্রীমন্তের বেহুলার, লহনার ছুঁয়েছে চরণ;
মেঠো পথে মিশে আছে কাক আর কোকিলের শরীরের ধুল,

কবেকার কোকিলের, জানো কি তা? যখন মুকুন্দরাম, হায়,
লিখিতেছিলেন বসে দু-পহরে সাধের সে চন্ডিকামঙ্গল,
কোকিলের ডাক শুনে লেখা তার বাধা পায় — থেমে থেমে যায়; —
অথবা বেহুলা একা যখন চলেছে ভেঙে গাঙুড়ের জল
সন্ধ্যার অন্ধকারে, ধানখেতে, আমবনে, অস্পষ্ট শাখায়
কোকিলের ডাক শুনে চোখে তার ফুটেছিল কুয়াশা কেবল।

আজ সৃষ্টি -সুখের উল্লাসে

কাজী নজরুল ইসলাম

(১৮৯৯-১৯৭৬)

আজ সৃষ্টি -সুখের উল্লাসে —
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে!
আসল হাসি, আসল কাঁদন,
মুক্তি এলো, আসল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুঃখের-সুখ আসে!
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে —
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আসল উদাস, শ্বসল হুতাশ,
সৃষ্টি-ছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুললো সাগর দুললো আকাশ ছুটলো বাতাস,
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিনাক পাণির শূল আসে!
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উলটাতে,

আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ হাসল আগুন, শ্বসল ফাগুন,
মদন মারে খুন-মাখা তূণ
পলাশ অশোক শিমুল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক-বাসে
গো দিগ্‌বালিকার পীতবাসে;
আজ রঙ্গান এলো রক্ত প্রাণের অঙ্গানে মোর চারপাশে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ কপোট কোপের তূণ ধরি
ঐ আসল যত সুন্দরী,
কারুর গায়ে বুক-ডলা খুন, কেউ বা আগুন,
কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে!
তাদের প্রাণের ‘বুক-ফাটে তাও মুখ-ফোটে-না’ বাণীর
বীণা মোর পাশে,
ঐ তাদের কথা শোনাই তাদের
আমার চোখে জল আসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ আসল উষা, সন্ধ্যা, দুপুর,
আসল নিকট আসল সুদূর,

আসল বাধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন
পাগলা-গাজন-উচ্ছ্বাসে!
        ঐ   আসল আশিন শিউলি শিথিল
                    হাসল শিশির দুব ঘাসে
                    আজ   সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

        আজ   জাগল সাগর, হাসল মরু
                    কাঁপল ভূধর, কানন-তরু,
                    বিশ্ব-ডুবান আসল তুফান, উছলে উজান
                    ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর ডাইনে শিশু সদ্যজাত জরায়-মরা বাম পাশে!
মন ছুটছে গো আজ বল্গা-হারা অশ্ব যেন পাগলা সে!
        আজ   সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
        আজ   সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

ত্রিরত্ন

কালিদাস রায়

(১৮৮৯-১৯৭৫)

এল দিগ্‌জয়ী দিগ্‌গজ বীরপণ্ডিত ব্রজধামে,
যেন রণমদে মত্ত দন্তী পঙ্কজবনে নামে।
অশ্বমুণ্ডে উড়ায়ে ঝাণ্ডা চারণ ফুকারি চলে,
চতুর্দোলায় পণ্ডিত দোলে বিজয়মাল্য গলে।
জয়নাদ তুলি অনুচরগুলি চলে তার পাছে পাছে,
ভয়ে সবে পুথিপত্র গুটায়, কেহ না আগায় কাছে।

রূপ সনাতন রহেন দুজন সাধনভজন-রত,
কে আসে কে যায় ব্রজে তার খোঁজ রাখেন না অতশত।
পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁহাদের রটিয়াছে সারা দেশে,
বিচারমল্ল তাই শুনে আজ অভিযান করে শেষে।
দুই ভাই ব্রজে প্রেমাবেশে মজি বিভোর আছেন সুখে,
'য়ুদ্ধং দেহি' হাঁকিয়া দাঁড়াল সে তাঁদের সম্মুখে।
পরমাগ্রহে মৃদু হাসি দোঁহে বসাইয়া সমাদরে
বিজয়-পত্রী লিখিয়া দিলেন জয়-ভিখারির করে।

বিজয়গর্বে তূর্য বাজায়ে পণ্ডিত যায় ফিরে,
সূর্য তখন মাথার উপরে উঠিতেছে ধীরে ধীরে।
পথের জনতা ভয়ে-বিস্ময়ে দু-ধারে দাঁড়ায় সরি,

সিক্তবসনে শ্রীজীব তখন ফিরিছেন স্নান করি।
সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন জীব শুনিয়া আস্ফালন —
'বিনা বিচারেই হার মেনেছেন রূপ আর সনাতন!'

শুনি শ্রীজীবের ধৈর্য টলিল, বলিলেন, "পণ্ডিত,
এসো, আমি দিব দম্ভের তব প্রতিফল সমুচিত।
যাঁদের কুঞ্জে তুমি দিগ্‌গজ করেছিলে অভিযান,
তাঁদের আমি তো চরণাশ্রিত শিষ্য ও সন্তান;
পেয়েছি তাঁদের জ্ঞানসাগরের শুধু এক অঞ্জলি,
মোরে জিনি তবে জয়গৌরবে ব্রজ থেকে যাবে চলি।"

তরুণ কণ্ঠে শুনি অকুণ্ঠ রণে-আহ্বান-বাণী
অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিল পণ্ডিত অভিমানী।
বলিল, "মূর্খ, কেশরী কি কভু ক্ষুদ্র শশকে বধে?
পারাবার পার হয়ে এসে শেষে ডুবিব কি গোষ্পদে?"
বাহকবৃন্দে বলিল সে, "চল, কেন রয়ে গেলি থেমে?"
জীব বলিলেন, "তিষ্ঠ কেশরী, দোলা হতে এস নেমে।"

তর্ক বাধিল যমুনার তীরে — দলে দলে সেথা আসি
দুই মল্লেরে দাঁড়াইল ঘিরে কুতূহলী পুরবাসী।
হানিতে লাগিল পণ্ডিত যত শাণিত প্রশ্নবাণ,
হেলায় সে-সব করিলেন জীব খণ্ডিত খান খান।
দুই দণ্ডেই হল দণ্ডিত পণ্ডিত দাম্ভিক,
শুনিতে পাইল জনতায় শুধু ধ্বনিতেছে "ধিক ধিক"।

অবনতশির বিতণ্ডাবীর পাণ্ডুর মুখে ধীরে
ধ্বজা গুটাইয়া সোজা পলাইল মথুরার দিকে ফিরে।

ব্রজবাসীগণ শুভসংবাদ ভাবি, পুলকিত মনে
জানাল এ কথা — বিজয়-বারতা — রূপ আর সনাতনে।
সিক্ত বসন শুকায়েছে গায়, তৃতীয় প্রহর বেলা,
আরো দেরি হল ফিরিতে জীবের ঠেলি জনতার মেলা।

কুঞ্জে তখনো গ্রহণ করেনি কেহই অন্নজল —
বলিলেন রূপ, "জীব, পিছে তব এত কেন কোলাহল?
শুচি হয়ে আজ আসো নাই তুমি স্নান করি যমুনায়,
যশ-প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা মেখে এলে সারা গায়।
মুখদর্শন করিব না তব — বৃথা তোমা পালিলাম,
রাজসভা তব সুযোগ্য ঠাঁই, নহে এই ব্রজধাম।"

চরণে পড়িয়া শ্রীজীব কতই করিলেন অনুনয়,
রূপের হৃদয় গলিল না তায়, কোপের হল না ক্ষয়।
শ্রীজীব তখন যমুনার তীরে তমাল-তরুর তল
আশ্রয় করি রহিলেন পড়ি ত্যজিয়া অন্নজল।
সকল সময় চোখে ধারা বয়, ফুলে ফুলে উঠে বুক,
শ্রীহরির নাম জপে অবিরাম বসনে ঢাকিয়া মুখ।

শ্রীজীবের দশা দেখে সনাতন মর্মে পেলেন ব্যথা,
করিল কাতর তাঁর অন্তর শ্রীজীবের কাতরতা।
বিরূপ শ্রীরূপে কহিলেন চুপে, "শ্রীজীবে ত্যজিলে কেন?
বৈষ্ণবগুরু হয়ে তব কেন বিকৃত বুদ্ধি হেন!
গুরুমর্যাদা রক্ষা করাই ছিল তার মনে সাধ,
আমি তো দেখি না এর বেশি কিছু গুরুতর অপরাধ।"

রূপ কহিলেন, "বুঝাবার ভাই আছে কিছু প্রয়োজন?
হয়ে বৈষ্ণব জ্ঞানের গরব করেনি সে বর্জন।

তরু হতে যেবা হয় সহিষ্ণু, তৃণ হতে দীনতর,
সেই বৈষ্ণব — জয়গৌরব ভাবে না সে কভু বড়ো।
গুরুমর্যাদা? — হায় অদৃষ্ট, গুরুরেও সে না চিনে,
এত উপদেশে হল হায় শেষে এ শিক্ষা এতদিনে!”

শুনি সনাতন মৃদু হেসে কন, “ত্যজিবারে অভিমান।
পারে নাই জীব, এখনো বালক, আমাদেরি সন্তান।
তুমি তার তাত, তুমি গুরু ভ্রাতঃ, পারিলে না আজো হায়
বৈষ্ণব হয়ে রোষ জিনিবারে — দোষ কিছু নাই তায়?
সেই অছিলায় ত্যজিব তোমায়? দীনতার অভিমান —
তাও অভিমান, বৈষ্ণব-মনে তাও পাবে কেন স্থান?
সেই অভিমান থাকে যদি মনে, বৈষ্ণব মোরা নই;
জীবে দয়া তব পরম ধর্ম, ‘জীবে’ দয়া তব কই?”

এ কথা শুনিয়া চমকি উঠিয়া রূপ কহিলেন কাঁদি —
“কী কথা শুনালে! হায়, তার চেয়ে আমিই তো অপরাধী।
বৈষ্ণব হয়ে ক্ষমা করিতে তো পারিনি-কো সন্তানে,
না বুঝে অশনি হেনেছি জীবের কুসুমকোমল প্রাণে!
যাও ভাই যাও, এক্ষণি গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো তারে,
না জানি কত-না পায় সে যাতনা এ মূঢ়ের অবিচারে।”

সনাতন-সাথে শ্রীজীব এলেন, কঙ্কালসার দেহ,
অরুণ নয়ন, ছিন্ন বসন, চিনিতে পারে না কেহ।
জীবে বুকে ধরি কাঁদিলেন রূপ অবুঝ শিশুর মতো,
বার বার তার ললাট চুমিয়া জুড়ায়ে দিলেন ক্ষত।
চারি চক্ষুর ধারায় তিতিল বৃন্দাবনের রজ,
শুচি হল তায় দিগ্‌বিজয়ীর পরশে অশুচি ব্রজ।

পাণ্ডুলিপি

বুদ্ধদেব বসু

(১৯০৮-১৯৭৪)

অজীর্ণ রোগে শীর্ণ, মগজে
পক্ষপাতী পাটিগণিত ঠাসা;
মাথার অল্প চুল তেলে চিকচিকে,
চোখ দুটো ধূর্ত, লোভে হলদে।
সে তার তেল-চিটচিটে, স্যাঁতসেঁতে আঙুল দিয়ে
নেড়ে-চেড়ে দেখছে আমার পাণ্ডুলিপির
পাতাগুলো,
যা এর আগে আমি ছাড়া কেউ ছোঁয়নি;
আর তার ধূর্ত চোখের ছোটো-ছোটো গর্ত
আমার দিকে মিটমিট করে বলছে —
'এ-বই আপনার চলবে তো?'
মনে পড়ল সারা রাত জেগে এই বই যখন শেষ করেছিলুম।
নিজেকে মনে হয়েছিল দেবতা,
যেন এই সাদা পাতাগুলো দিয়ে ছোটো একটি সূর্য আমি তৈরি করেছি,
একটি সূর্য, আমারই প্রাণে জ্বলন্ত।

আর সেই কাক-ভোরে
বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ
ঘুমোতে পারিনি আনন্দে।
যে গাইতে পারে তার গলা বেয়ে যেমন ওঠে গান,
তেমনি আনন্দ উঠছিল আমার বুক ঠেলে।
ক্লান্ত শরীর, চোখে ঘুমের তৃষ্ণা, তবু আনন্দে
ঘুমোতে পারিনি।

আর তারপর এই ধূর্ত চোখের ছোটো-ছোটো মিটমিটে গর্ত
আর লোভে-চিটচিটে দুটো থাবা
আমার পাণ্ডুলিপিটা চটকাচ্ছে।

ভেবেছিলুম একটা মির‍্যাকল ঘটবে, ঘটল না।
ফেটে পড়ল না আমার ছোটো সূর্য, দারুণ বিস্ফোরণে।
সে তার নোংরা, স্যাঁতসেঁতে আঙুলগুলো রাখল আমার লেখার গায়ে —
তবু বেঁচে রইল।
অবাক হয়ে গেলুম।

ভয় করলেই ভয়

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(জন্ম : ১৯২৪)

চলো, বেরিয়ে পড়ি।
আকাশ এখন ক্রমেই রেগে যাচ্ছে।
যাক।
ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছু না।
রাস্তাময়
ইটের টুকরো, বোতল-ভাঙা কাচের গুঁড়ো
ছড়িয়ে আছে। থাক।
যার যা ইচ্ছে করুক।
ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছু না।
একটু-আধটু রক্ত হয়তো ঝরতে পারে। ঝরুক।
ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছু না।
চলো, বেরিয়ে পড়ি।

দেখো, ঠিক আমরা পৌঁছে যাব।
এসো, যাই।
ঘরের মধ্যে
হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে
কে কবে কোন্‌খানে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছে?

চলো, বেরিয়ে পড়ি।
জানি, রাস্তা এখন ক্রমেই আরও তেতে উঠছে।
উঠুক।
ঘরই জ্বলে, রাস্তা কে আর জ্বালায়?
দেখতে পাচ্ছি,
ওদের চোখে বিন্দু-বিন্দু রক্ত ফুটছে।
ফুটুক।
কাউকে একবার ঘুরে দাঁড়াতে দেখলেই ওরা পালায়।
ওদের মারমুখো ওই ভঙ্গিটা তো আর কিছু নয়,
লোক-দেখানো লোক-ঠকানো
ছলা।
চলো, বেরিয়ে পড়ি।
ভয় করলেই ভয় করলেই ভয়, নইলে দেখো,
কিছু না, কাঁচকলা।

এই নবান্নে

সুকান্ত ভট্টাচার্য
(১৯২৬-১৯৪৭)

এই হেমন্তে কাটা হবে ধান,
আবার শূন্য গোলায় ডাকবে ফসলের বান —
পৌষপার্বণে প্রাণ-কোলাহলে ভরবে গ্রামের নীরব শ্মশান।
তবুও এ হাতে কাস্তে তুলতে কান্না ঘনায়:
হালকা হাওয়ায় বিগত স্মৃতিকে ভুলে থাকা দায়;
গত হেমন্তে মরে গেছে ভাই, ছেড়ে গেছে বোন,
পথে-প্রান্তরে খামারে মরেছে যত পরিজন;
নিজের হাতের জমি ধান-বোনা
বৃথাই ধুলোতে ছড়িয়েছে সোনা,
কারোরই ঘরেতে ধান তোলবার আসেনি শুভক্ষণ —
তোমার আমার খেত ফসলের অতি ঘনিষ্ঠ জন।

এবার নতুন জোরালো বাতাসে
জয়যাত্রার ধ্বনি ভেসে আসে,
পিছে মৃত্যুর ক্ষতির নির্বচন —
এই হেমন্তে ফসলেরা বলে : কোথায় আপন জন?

তারা কি কেবল লুকোনো থাকবে,
অক্ষমতার গ্লানিকে ঢাকবে,
প্রাণের বদলে যারা প্রতিবাদ করেছে উচ্চারণ
এই নবান্নে প্রতারিতদের হবে না নিমন্ত্রণ?

সামান্যই প্রার্থনা

বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী
(১৯২৯-১৯৯২)

চাইনে তুফান তবুও ঝড় ওঠে
চাইনে প্লাবন চাইনে খরা, চাইনে মারি
চাইনে বিষাদ, চাইনে বচসা কিংবা বিবাদ
চাইনে দাঁতের বদলে দাঁত, ইটের বদলে ইট
অস্ত্র কিংবা শস্ত্র
চাইনে গজদন্ত মিনার অথবা
দিস্তের পর দিস্তে জুড়ে যোজনার খতিয়ান

বদলে দাও
একখণ্ড বস্ত্র, দুয়েক মুঠো অন্ন, কিঞ্চিৎ অক্ষর জ্ঞান,
কিছু ফুল আঙিনায়, এক চিলতে খড়ের চাল
মাথার ওপরে, কিছু কিছু স্বাধীনতা আর

আর পৃথিবীর কোলে জীবলীলা শেষ হলে আরো
কিছু সৌহার্দ্য-মাটি ও মানুষের॥

স্যার আইজাক নিউটন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(১৮২০-১৮৯১)

যে বৎসর গালিলির কলেবর পরিত্যাগ করেন, সেই বৎসরে আইজাক নিউটনের জন্ম হয়। এই মহাপুরুষ, লিঙ্কলনসায়রের অন্তঃপাতী কোল্টর্সওয়ার্থনামক গ্রামে ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর, শরীর পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা তাদৃশ সংগতিপন্ন ছিলেন না, কেবল যৎকিঞ্চিৎ ভূমি কর্ষণ দ্বারা জীবিকাসম্পাদন করিতেন। বোধ হয়, নিউটন কোপার্নিকসের ও গালিলিয়ের উদ্ভাবিত বিষয়সমূহের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি, প্রথমত মাতৃসন্নিধানে কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া, দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, গ্রন্থামনগরের লাটিন পাঠশালায় প্রেরিত হন। তথায় শিল্পবিষয়ক নব নব কৌশল প্রকাশ দ্বারা, তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধির লক্ষণ প্রদর্শিত হয়। ঐ সকল শিল্পকৌশল দর্শনে তত্রত্য লোকেরা চমৎকৃত হইয়াছিল। পাঠশালার সকল বালকই, বিরামের অবসর পাইলে, খেলায় আসক্ত হইত; কিন্তু তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট্ট প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্মাণ করিতেন। একদা, তিনি একটা পুরাণ বাক্স লইয়া জলের ঘড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘড়ির শঙ্কু বাক্সমধ্য হইতে অনবরত নির্গত জল বিন্দুপাত দ্বারা নিমগ্নকাষ্ঠখণ্ড প্রতিঘাতে, পরিচালিত হইত; বেলাববোধনার্থ তাহাতে একটি প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।

নিউটন পাঠশালা হইতে বহির্গত হইলে, ইহাই স্থির হইয়াছিল, তাহাকে কৃষিকর্ম অবলম্বন করিতে হইবেক। কিন্তু অতি ত্বরায় ব্যক্ত হইল, তিনি ওরূপ পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপারে কোনও ক্রমে সমর্থ নহেন। সর্বদা এরূপ দেখা যাইত, যে সময় তাঁহাকে পশুরক্ষণ ও ভৃত্যগণের প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবেক, তখনও তিনি নিশ্চন্ত মনে তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন করিতেন। কৃষিলব্ধদ্রব্যজাতবিক্রয়ার্থে গ্রন্থামের

আপণে প্রেরিত হইলে, তিনি স্বসমভিব্যাহারী বৃদ্ধ ভৃত্যের উপর সমস্ত কার্যনির্বাহের ভার সমর্পণ করিয়া, পরিশুষ্ক তৃণরাশির উপর উপবেশন পূর্বক, গণিতবিষয়ক প্রশ্ন সমাধান করিতেন। জননী, বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে তাঁহার এইরূপ স্বাভাবিক অতি প্রগাঢ় অনুরাগ দর্শনে সমুৎসুকা হইয়া, পুনর্বার আর কয়েক মাসের নিমিত্ত, তাঁহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। পরে, ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের ৫ই জুন, তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী ত্রিনীতিনামক বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

নিউটন পরিশ্রম, প্রজ্ঞা, সুশীলতা ও অহমিকাশূন্য আচরণ দ্বারা আইজাক বারো প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গের অনুগৃহীত ও সহাধ্যায়িগণের প্রশংসাভূমি ও প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি কেম্ব্রিজে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রথমত সন্ডর্সনরচিত ন্যায়শাস্ত্র, কেপ্লরপ্রণীত দৃষ্টিবিজ্ঞান, ওয়ালিসলিখিত অস্থিতপাটিগণিত এই কয়েক গ্রন্থ পাঠ করেন; সাতিশয়পরিশ্রমসহকারে ডেকার্টরচিত রেখাগণিত গ্রন্থ অধ্যায়ন করেন; আর, তৎকালে নক্ষত্রবিদ্যার কিছু কিছু চর্চা থাকাতে, তাহারও অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি ইউক্লিডের গ্রন্থ অত্যল্পমাত্র পাঠ করেন। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে তিনি, প্রাচীন গণিতজ্ঞদিগের গ্রন্থ উত্তমরূপে পাঠ করা হয় নাই বলিয়া, উত্তরকালে অনুতাপ করিয়াছিলেন।

নিউটন, কেম্ব্রিজ অধ্যয়নকালে, আলোকপদার্থের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ অত্যন্ত যত্নবান হইয়াছিলেন। ইহার পূর্বে এই বিষয়ে লোকের অত্যল্প জ্ঞান ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ডেকার্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, অন্তরীক্ষব্যাপী স্থিতিস্থাপকগুণোপেত অতি বিরল পদার্থ বিশেষের সঞ্চালনবিশেষ দ্বারা আলোকের উৎপত্তি হয়। নিউটন এই মত খণ্ডন করিলেন। তিনি অন্ধকারাবৃতগৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্বক, বহুকোণবিশিষ্ট একখণ্ড কাচ লইয়া, কপাটের ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা তদুপরি সূর্যের কিরণ পাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাইলেন, আলোক কাচের মধ্য দিয়া গমন করিয়া এ প্রকার ভঞ্জুর হইয়াছে যে, ভিত্তির উপর সপ্তবিধ বিভিন্ন বর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তর, অসাধারণকৌশল পূর্বক অশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া, তিনি এই কয়েক মহোপকারক বিষয় নির্ধারিত করিলেন — আলোক পদার্থ কিরণাত্মক; ঐ সকল কিরণকে বিভক্ত করিয়া অণু করা যাইতে পারে; শুক্ল আলোকের প্রত্যেক কিরণে রক্ত , পীত, নীল এই তিন মূলীভূত কিরণ আছে; এই ত্রিবিধ কিরণ অপেক্ষাকৃত ন্যূনাধিক ভঞ্জুর হইয়া থাকে। নিউটনের এই অসাধারণ অভিনব আবিষ্ক্রিয়াকে দৃষ্টিবিজ্ঞানশাস্ত্রের মূলসূত্রস্বরূপ গণনা করিতে হইবেক।

১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে, কেম্ব্রিজনগরে ঘোরতর মারিভয় উপস্থিত হওয়াতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্রকে স্থানত্যাগ করিতে হইয়াছিল। নিউটনও ঐ সময়ে আত্মরক্ষার্থে আপন আলয়ে পলায়ন করিলেন। তথায় পুস্তকালয়ের অসদ্ভাবপ্রযুক্ত ইচ্ছানুরূপ পুস্তক পাঠ করিতে পাইতেন না; এবং পণ্ডিতবর্গের অসন্নিধানপ্রযুক্ত শাস্ত্রীয় আলাপেরও সুযোগ ছিল না, তথাপি তিনি ঐ সময়ে গুরুত্বের নিয়ম অর্থাৎ বস্তুমাত্রের ভূতলাভিমুখে পাতপ্রবণতার বিষয় প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মহীয়সী আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা, নিউটনের অনধ্যায় বৎসর সকল, তাঁহার জীবনের শ্লাঘ্যতম ভাগ ও বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় ইতিবৃত্তের চিরস্মরণীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

এক দিবস তিনি উপবনমধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দৈবযোগে তাঁহার সম্মুখবর্তী আতাবৃক্ষ হইতে এক ফল পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ বস্তুমাত্রের পতননিয়ামক সাধারণ কারণবিষয়িণী পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর, তিনি এই বিষয় পুনর্বার আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে কারণবশত আতা ভূতলে পতিত হইল, সেই কারণেই চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী স্ব স্ব কক্ষে ব্যবস্থাপিত আছে, এবং তাহাই পরমাদ্ভূত শক্তিসহকারে অতি সহজে সমুদয় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি নিয়মিত করিতেছে। এই রূপে গুরুত্বের নিয়ম আবিষ্কৃত হইল। এই নিয়মের জ্ঞান দ্বারা জ্যেতির্বিদ্যার মহয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

নিউটন, ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে, কেম্ব্রিজে প্রত্যাগমন করিয়া, ত্রিনীতি বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তিপ্রাপ্ত হইলেন। দুই বৎসর পরে, তাঁহার বন্ধু ডক্তর বারো গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক পরিত্যাগ করিলে, তিনি তাহাতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি দৃষ্টিবিজ্ঞানবিষয়ে যে সকল অভিনব মহৎ নিয়ম প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রথমত কিছু কাল ঐ সমস্ত লইয়াই অধিকাংশ উপদেশ প্রদান করিলেন। আলোক ও বর্ণ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকাতে, আপনার নূতন মত এমন স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিলেন যেন, শ্রোতৃবর্গ সন্তুষ্ট চিত্তে ভুরি ভুরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে, রএল সোসাইটি নামক রাজকীয় সমাজের ফেলো অর্থাৎ সহযোগী হইলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধি আছে, অন্যান্য সহযোগীর ন্যায় সভার ব্যয়নির্বাহার্থে প্রতি সপ্তাহে রীতিমতো এক এক শিলিং দিতে অসমর্থ হওয়াতে তাঁহাকে অগত্যা অদানের অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। তৎকালে বিদ্যালয়ের বৃত্তি ও অধ্যাপকের বেতন এতদ্ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কোনও প্রকার অর্থাগম ছিল না; আর, পৈতৃক বিষয় হইতে যে কিছু কিছু উৎপন্ন হইত, তাহা তাঁহার জননী ও অন্যান্য পরিবারের

গ্রাসাচ্ছাদনেই পর্যবসিত হইত। তাঁহার ভোগতৃষ্ণা এত অল্প ছিল যে, আবশ্যক পুস্তকের ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ক্রয় এবং অন্যের দারিদ্র্য দুঃখবিমোচন এই উভয় সম্পন্ন হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন, এতদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ে অর্থাভাব জন্য ক্ষুণ্ণমনা হইতেন না।

১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে, তিনি প্রিন্সিপিয়ানামক অতি প্রধান গ্রন্থ রচনা করিলেন। ঐ পুস্তকে গণিত শাস্ত্রানুসারে পদার্থবিদ্যার মীমাংসা করা হইয়াছে। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে, যখন রাজবিপ্লব ঘটে, কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের প্রতিরূপ হইয়া, পার্লিমেন্ট নামক সমাজের উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, সকলে তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিল; এবং ১৭০১ খ্রিস্টাব্দেও ঐ মর্যাদার পদ পুনর্বার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির যথার্থ উপকার ও পুরস্কার করিবার ক্ষমতা ছিল, নিউটনের অসাধারণ গুণ তাঁহাদের গোচর হওয়াতে, তিনি তদীয় আনুকূল্যবলে টাকশালের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধানবিষয়ে অত্যন্ত সহিষ্ণুতা ও সবিশেষ নৈপুণ্য থাকাতে, তিনিই সর্বাপেক্ষায় ঐ পদের উপযুক্ত ছিলেন। নিউটন মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ কার্য সম্পাদন করিয়া সর্বত্র সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর নিউটন বহুতর প্রশংসা ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। লিবনিজ নামক একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, নিউটনের নব নব আবিষ্ক্রিয়া নিবন্ধন অসাধারণ সম্মান দর্শনে ঈর্ষাপরবশ হইয়া তদ্বিলোপবাসনায় তাঁহার নিকট এক প্রশ্ন প্রেরণ করেন। তিন মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, নিউটন কোনও রূপেই ইহার সমাধান করিতে পারিবেন না, তাহা হইলেই তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবেক। নিউটন টাকশালের সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সায়াহ্নে ঐ প্রশ্ন পাইলেন এবং শয়নের পূর্বেই তাহার সমাধান করিয়া রাখিলেন। তৎপরে আর কোনও ব্যক্তি কখনও নিউটনের কীর্তিবিলোপের চেষ্টা করেন নাই। ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে, ইংলন্ডেশ্বরী এন, নিউটনের মান বর্ধনার্থে, তাঁহাকে নাইট উপাধি প্রদান করেন।

নিউটন উদারস্বভাবতা প্রযুক্ত সামান্য সামান্য লৌকিক ব্যাপারেও সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি সর্বদা আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং তাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, সমুচিত সমাদর করিতেন; কথোপকথনকালে কখনও আত্মপ্রাধান্য প্রখ্যাপন করিতেন না। তিনি স্বভাবত সুশীল, সরল ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন; এই নিমিত্ত সকল ব্যক্তি তাঁহার সহবাসবাসনা করিত। লোকের সর্বদা যাতায়াত দ্বারা তাঁহার মহার্ঘ সময়ের অপক্ষয় হইত, তথাপি তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তভাব প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু প্রত্যুষে গাত্রোত্থানের নিয়ম এবং বিশেষ বিশেষ কার্যে

বিশেষ সময় নিরূপিত থাকাতে, অধ্যয়ন ও গ্রন্থরচনার নিমিত্ত তাঁহার সময়াল্পতা নিবন্ধন কোনও ক্ষোভ থাকিত না। তিনি অবসর পাইলে হস্তে লেখনী ও সম্মুখে পুস্তক লইয়া বসিতেন।

নিউটন অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। তিনি কহিতেন, যাঁহারা জীবদ্দশায় দান না করেন, তাঁহাদের দান দানই নয়। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে তদীয় অদ্ভুত ধীশক্তির কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। আহারনিয়ম, সার্বকালিক প্রফুল্লচিত্ততা ও স্বাভাবিক শরীরপটুতা প্রযুক্ত জরা তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, নাতিস্থূলকায় ছিলেন। তাঁহার নয়নে সজীবতা, তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধিমত্তা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত। দেখিলেই তাঁহার আকৃতি সজীবতা ও দয়ালুতাতে পরিপূর্ণ বোধ হইত। অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার দর্শনশক্তি অব্যাহত ছিল। কেশ সকল শেষ বয়সে তুষারের ন্যায় শুভ্র হইয়াছিল। চরম দশাতে তাঁহার অসহ্য দৈহিক যাতনা ঘটে। কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধ সহিষ্ণুতা প্রভাবে তাহাতে নিতান্ত কাতর হয়েন নাই। অনন্তর, ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দের ২০শে মার্চ, চতুরশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

নিউটনের চরিত্র সাধারণ লোকের চরিত্রের ন্যায় নহে। উহা এমন সুন্দর যে, চরিতাখ্যায়ক ব্যক্তি লিখিতে লিখিতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। আর, যে উপায়ে তিনি মনুষ্যমণ্ডলীতে অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পর্যালোচনা করিলে, মহোপকার ও মহার্থ লাভ হইতে পারে। নিউটন অত্যুৎকৃষ্ট বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তদপেক্ষায় ন্যূনবুদ্ধিরাও তদীয়জীবনবৃত্তপাঠে পদে পদে উপদেশ লাভ করিতে পারেন। তিনি অলৌকিক বুদ্ধি শক্তির প্রভাবে গ্রহগণের গতি, ধূমকেতুগণের কক্ষ, সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। নিউটন আলোক ও বর্ণ এই দুই পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে এই বিষয় কোনও ব্যক্তির মনেও উদিত হয় নাই। তিনি সাতিশয় পরিশ্রম ও দক্ষতা সহকারে অদ্ভুত বিশ্বরচনার যথার্থ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আর, তাঁহার সমুদয় গবেষণা দ্বারাই সৃষ্টিকর্তার মহিমা, প্রজ্ঞা ও অনুকম্পা প্রকাশ পাইয়াছে।

ঈদৃশলোকোত্তরবুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন হইয়াও, তিনি স্বভাবত এমন বিনীত ছিলেন যে, আপন বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান করিতেন না। তাঁহার এই এক সুপ্রিসিদ্ধ কথা ধরাতলে জাগরূক আছে, আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সংকলন করিতেছি, জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

দস্যু-কবলে

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৮৩৮-১৮৯৪)

অনন্ত মিশ্র, চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুলপুরোহিত। কন্যানির্বিশেষে, চঞ্চলকুমারীকে ভালোবাসিতেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত। চঞ্চলের নাম করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবামাত্র তিনি অন্তঃপুরে আসিলেন — কুলপুরোহিতের অবারিতদ্বার। পথিমধ্যে নির্মল তাঁহাকে গ্রেফতার করিল এবং সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল।

বিভূতিচন্দনবিভূষিত, প্রশস্তললাট, দীর্ঘকায়, রুদ্রাক্ষশোভিত, হাস্যবদন সেই ব্রাহ্মণ চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নির্মল দেখিয়াছিল যে, চঞ্চল কাঁদিতেছে, কিন্তু আর কাহারও কাছে চঞ্চল কাঁদিবার মেয়ে নহে। গুরুদেব দেখিলেন, চঞ্চল স্থিরমূর্তি। বলিলেন, "মা লক্ষ্মী — আমাকে স্মরণ করিয়াছ কেন?"

চঞ্চল। আমাকে বাঁচাইবার জন্য। আর কেহ নাই যে, আমায় বাঁচায়।

অনন্ত মিশ্র হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, রুক্মিণীর বিয়ে, তাই পুরোহিত-বুড়াকেই দ্বারকায় যেতে হবে। তা দেখো দেখি মা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কিছু আছে কি না — পথখরচটা জুটিলেই আমি উদয়পুরে যাত্রা করিব।"

চঞ্চল একটি জরির থলি বাহির করিয়া দিল। তাহাতে আশরফি ভরা। পুরোহিত পাঁচটি আশরফি লইয়া অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিলেন — বলিলেন, "পথে অন্নই খাইতে হইবে — আশরফি খাইতে পারিব না। একটি কথা বলি, পারিবে কি?"

চঞ্চল বলিলেন, "আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলিলেও, আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তাও পারি। কী আজ্ঞা করুন।"

মিশ্র। রানা রাজসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "আমি বালিকা — পুরস্ত্রী; তাঁহার কাছে অপরিচিতা — কী প্রকারে পত্র লিখি? কিন্তু আমি তাঁহার কাছে যে ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহাতে লজ্জারই বা স্থান কই? লিখিব।"

মিশ্র। আমি লিখাইয়া দিব, না আপনি লিখিবে?

চঞ্চল। আপনি বলিয়া দিন।

নির্মল সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "তা হইবে না। এ বামুনে বুদ্ধির কাজ নয় — এ মেয়েলি বুদ্ধির কাজ। আমরা পত্র লিখিব। আপনি প্রস্তুত হইয়া আসুন।"

মিশ্র ঠাকুর চলিয়া গেলেন, কিন্তু গৃহে গেলেন না। রাজা বিক্রমসিংহের নিকট দর্শন দিলেন। বলিলেন, "আমি দেশ পর্যটনে গমন করিব, মহারাজকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছি।" কী জন্য কোথায় যাইবেন, রাজা তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা কিছু প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। তথাপি তিনি যে উদয়পুর পর্যন্ত যাইবেন, তাহা স্বীকার করিলেন এবং রানার নিকট পরিচিত হইবার জন্য একখানি লিপির জন্য প্রার্থিত হইলেন। রাজাও পত্র দিলেন।

অনন্ত মিশ্র রাজার নিকট হইতে পত্র সংগ্রহ করিয়া চঞ্চলকুমারীর নিকট পুনরাগমন করিলেন। ততক্ষণ চঞ্চল ও নির্মল দুই জনে দুই বুদ্ধি একত্র করিয়া একখানি পত্র সমাপন করিয়াছিল। পত্র শেষ করিয়া রাজনন্দিনী একটি কৌটা হইতে অপূর্ব শোভাবিশিষ্ট মুকুতাবলয় বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, "রানা পত্র পড়িলে, আমার প্রতিনিধিস্বরূপ আপনি এই রাখি বাঁধিয়া দিবেন। রাজপুতকুলের যিনি চূড়া, তিনি কখন রাজপুতকন্যার প্রেরিত রাখি অগ্রাহ্য করিবেন না।"

মিশ্র ঠাকুর স্বীকৃত হইলেন। রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় করিলেন।

পরিধেয় বস্ত্র, ছত্র, যষ্টি, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং একমাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, অনন্ত মিশ্র গৃহিণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া উদয়পুর

যাত্রা করিলেন। গৃহিণী বড়ো পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল, "কেন যাইবে?" মিশ্র ঠাকুর বলিলেন, "রানার কাছে কিছু বৃত্তি পাইব।" গৃহিণী তৎক্ষণাৎ শান্ত হইলেন; বিরহযন্ত্রণা আর তাঁহাকে দাহ করিতে পারিল না, অর্থলাভের আশাস্বরূপ শীতলবারি-প্রবাহে সে প্রচণ্ড বিচ্ছেদবহ্নি বার কত ফোঁস ফোঁস করিয়া নিবিয়া গেল। মিশ্র ঠাকুর ভৃত্য সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তিনি মনে করিলে অনেক লোক সঙ্গে লইতে পারিতেন, কিন্তু অধিক লোক থাকিলে কানাকানি হয়, এজন্য লইলেন না।

পথ অতি দুর্গম — বিশেষ পার্বত্য পথ বন্ধুর, এবং অনেক স্থানে আশ্রয়শূন্য। একাহারী ব্রাহ্মণ যে দিন যেখানে আশ্রয় পাইতেন, সে দিন সেখানে আতিথ্য স্বীকার করিতেন; দিনমানে পথ অতিবাহন করিতেন। পথে কিছু দস্যুভয় ছিল — ব্রাহ্মণের নিকট রত্নবলয় আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ কদাপি একাকী পথ চলিতেন না। সঙ্গী জুটিলে চলিতেন। সঙ্গী ছাড়া হইলেই আশ্রয় খুঁজিতেন। একদিন রাত্রে এক দেবালয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া, পরদিন প্রভাতে গমনকালে, তাঁহাকে সঙ্গী খুঁজিতে হইল না। চারিজন বণিক ঐ দেবালয়ের অতিথিশালায় শয়ন করিয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া তাহারাও পার্বত্যপথে আরোহণ করিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া উহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইবে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি উদয়পুর যাইব।" বণিকেরা বলিল, "আমরাও উদয়পুর যাইব। ভালো হইয়াছে একত্রে যাই চলুন।" ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গী হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদয়পুর আর কত দূর?" বণিকেরা বলিল, "নিকট। আজ সন্ধ্যার মধ্যে উদয়পুর পৌঁছিতে পারিব। এ সকল স্থান রানার রাজ্য।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা চলিতেছিল। পার্বত্য পথ, অতিশয় দুরারোহণীয় এবং দুরবরোহনীয়, সচরাচর বসতিশূন্য। কিন্তু এই দুর্গম পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল — এখন সমতল ভূমিতে অবরোহণ করিতে হইবে। পথিকেরা এক অনির্বচনীয় শোভাময় অধিত্যকায় প্রবেশ করিল। দুই পার্শ্বে অনতি-উচ্চ পর্বতদ্বয়, হরিত-বৃক্ষাদিশোভিত হইয়া আকাশে মাথা তুলিয়াছে, উভয়ের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষুদ্রা প্রবাহিণী নীলকাচপ্রতিম সফেন জলপ্রবাহে উপলদল ধৌত করিয়া বনানীর অভিমুখে চলিতেছে। তটিনীর ধার দিয়া মনুষ্যগম্য পথের রেখা পড়িয়াছে। সেখানে নামিলে, আর কোনো দিক হইতে কেহ পথিককে দেখিতে পায় না; কেবল পর্বতদ্বয়ের উপর হইতে দেখা যায়।

সেই নিভৃত স্থানে অবরোহণ করিয়া, একজন বণিক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার ঠাঁই টাকা-কড়ি কি আছে?”

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। ভাবিলেন, বুঝি এখানে দস্যুর বিশেষ ভয়, তাই সতর্ক করিবার জন্য বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে। দুর্বলের অবলম্বন মিথ্যা কথা। ব্রাহ্মণ বলিলেন, “আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কী থাকিবে?”

বণিক বলিল, “যাহা কিছু থাকে, আমাদের নিকট দাও। নহিলে এখানে রাখিতে পারিবে না।”

ব্রাহ্মণ ইতস্তত করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, রত্নবলয় রক্ষার্থ বণিকদিগকে দিই; আবার ভাবিলেন, ইহারা অপরিচিত, ইহাদিগকেই বা বিশ্বাস কি? এই ভাবিয়া ইতস্তত করিয়া ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ বলিলেন, “আমি ভিক্ষুক, আমার কাছে কী থাকিবে?”

বিপৎকালে যে ইতস্তত করে, সেই মারা যায়। ব্রাহ্মণকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া ছদ্মবেশী বণিকেরা বুঝিল যে, অবশ্য ব্রাহ্মণের কাছে বিশেষ কিছু আছে। একজন তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া তাঁহার বুকে হাঁটু দিয়া বসিল — এবং তাঁহার মুখে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল। মিশ্র ঠাকুরের ভৃত্যটি তৎক্ষণাৎ কোন্ দিকে পলায়ন করিল, কেহ দেখিতে পাইল না। মিশ্র ঠাকুর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া নারায়ণ স্মরণ করিতে লাগিলেন। আর একজন, তাঁহার গাঁটরি কাড়িয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার ভিতর হইতে চঞ্চলকুমারী-প্রেরিত বলয়, দুইখানি পত্র, এবং আশরফি পাওয়া গেল। দস্যু তাহা হস্তগত করিয়া সঙ্গীকে বলিল, “আর ব্রহ্মহত্যা করিয়া কাজ নাই। উহার যাহা ছিল, তাহা পাইয়াছি। এখন উহাকে ছাড়িয়া দে।”

আর একজন দস্যু বলিল, “ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। ব্রাহ্মণ তাহা হইলে এখনই একটা গোলযোগ করিবে। আজকাল রানা রাজসিংহের বড়ো দৌরাত্ম্য — তাঁহার শাসনে বীরপুরুষে আর অন্ন করিয়া খাইতে পারে না। উহাকে এই গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া যাই।”

এই বলিয়া দস্যুগণ মিশ্র ঠাকুরের হস্ত পদ এবং মুখ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে

দৃঢ়তর বাঁধিয়া, পর্বতের সানুদেশস্থিত একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বাঁধিল। পরে চঞ্চলকুমারীদত্ত রত্নবলয় ও পত্র প্রভৃতি লইয়া ক্ষুদ্র নদীর তীরবর্তী পথ অবলম্বন করিয়া পর্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে পর্বতের উপরে দাঁড়াইয়া একজন অশ্বারোহী তাহাদিগকে দেখিল। তাহারা, অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইল না, পলায়নে ব্যস্ত।

দস্যুগণ পার্বতীয়া প্রবাহিণীর তটবর্তী বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি দুর্গম ও মনুষ্য সমাগমশূন্য পথে চলিল। এইরূপ কিছু দূর গিয়া, এক নিভৃত গুহামধ্যে প্রবেশ করিল।

গুহার ভিতর খাদ্যদ্রব্য, শয্যা, পাকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত ছিল। দেখিয়া বোধ হয়, দস্যুগণ কখন কখন এই গুহামধ্যে লুকাইয়া বাস করে। এমনকি, কলশিপূর্ণ জল পর্যন্ত ছিল। দস্যুগণ সেইখানে উপস্থিত হইয়া তামাকু সাজিয়া খাইতে লাগিল এবং একজন পাকের উদ্যোগ করিতে লাগিল। একজন বলিল, “মানিকলাল, রসুই পরে হইবে। প্রথমে মালের কী ব্যবস্থা হইবে, তাহার মীমাংসা করা যাউক।”

মানিকলাল বলিল, “মালের কথাই আগে হউক।”

তখন আশরফি কয়টি কাটিয়া চারি ভাগ করিল। এক একজন এক এক ভাগ লইল। রত্নবলয় বিক্রয় না হইলে ভাগ হইতে পারে না — তাহা সম্প্রতি অবিভক্ত রহিল। পত্র দুইখানি কী করা যাইবে, তাহার মীমাংসা হইতে লাগিল। দলপতি বলিলেন, “কাগজে আর কী হইবে — উহা পোড়াইয়া ফেল।” এই বলিয়া পত্র দুইখানি সে মানিকলালকে অগ্নিদেবকে সমর্পণ করিবার জন্য দিল।

মানিকলাল কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে জানিত। সে পত্র দুইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আনন্দিত হইল। বলিল, “এ পত্র নষ্ট করা হইবে না। ইহাতে রোজগার হইতে পারে।”

“কী? কী?” বলিয়া আর তিনজন গোলযোগ করিয়া উঠিল। মানিকলাল তখন চঞ্চলকুমারীর পত্রের বৃত্তান্ত তাহাদিগকে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিল। শুনিয়া চোরেরা বড়ো আনন্দিত হইল।

মানিকলাল বলিল, “দেখ, এই পত্র রানাকে দিলে কিছু পুরস্কার পাইব।”

কাব্যরচনা চর্চা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১-১৯৪১)

সেই নীল খাতাটি ক্রমেই বাঁকা-বাঁকা লাইনে ও সরু-মোটা অক্ষরে কীটের বাসার মতো ভরিয়া উঠিতে চলিল। বালকের আগ্রহপূর্ণ চঞ্চল হাতের পীড়নে প্রথমে তাহা কুঞ্চিত হইয়া গেল। ক্রমে তাহার ধারগুলি ছিঁড়িয়া কতকগুলি আঙুলের মতো হইয়া ভিতরের লেখাগুলাকে যেন মুঠা করিয়া চাপিয়া রাখিয়া দিল। সেই নীল ফুলস্ক্যাপের খাতাটি লইয়া করুণাময়ী বিলুপ্তিদেবী কবে বৈতরণীর কোন্ ভাঁটার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন জানি না। আহা, তাহার ভবভয় আর নাই। মুদ্রাযন্ত্রের জঠর যন্ত্রণার হাত সে এড়াইল।

আমি কবিতা লিখি, এ খবর যাহাতে রটিয়া যায় নিশ্চয়ই সে-সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্য ছিল না। সাতকড়ি দত্ত মহাশয় যদিচ আমাদের ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন না তবু আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ ছিল। তিনি প্রাণিবৃত্তান্ত নামে একখানা বই লিখিয়াছিলেন। আশা করি কোনো সুদক্ষ পরিহাসরসিক ব্যক্তি সেই গ্রন্থলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ করিয়া তাঁহার স্নেহের কারণ নির্ণয় করিবেন না। তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি কবিতা লিখিয়া থাক।" লিখিয়া যে থাকি সে-কথা গোপন করি নাই। ইহার পর হইতে তিনি আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য মাঝে মাঝে দুই-এক পদ কবিতা দিয়া, তাহা পূরণ করিয়া আনিতে বলিতেন। তাহার মধ্যে একটি আমার মনে আছে —

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

আমি ইহার সঙ্গে যে-পদ্য জুড়িয়াছিলাম তাহার কেবল দুটো লাইন মনে আছে। আমার সেকালের কবিতাকে কোনোমতেই যে দুর্বোধ বলা চলে না, তাহারই প্রমাণস্বরূপে লাইনদুটোকে এই সুযোগে এখানেই দলিলভুক্ত করিয়া রাখিলাম —

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

ইহার মধ্যে যেটুকু গভীরতা আছে তাহা সরোবরসংক্রান্ত — অত্যন্তই স্বচ্ছ।

আর-একটি কোনো ব্যক্তিগত বর্ণনা হইতে চার লাইন উদ্ধৃত করি, আশা করি, ইহার ভাষা ও ভাব অলংকারশাস্ত্রে প্রাঞ্জল বলিয়া গণ্য হইবে —

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে —
হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

আমাদের ইস্কুলের গোবিন্দবাবু ঘনকৃষ্ণবর্ণ বেটেখাটো মোটাসোটা মানুষ। ইনি ছিলেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। কালো চাপকান পরিয়া দোতালায় আপিসঘরে খাতাপত্র লেখাপড়া করিতেন। ইঁহাকে আমরা ভয় করিতাম। ইনিই ছিলেন বিদ্যালয়ের দণ্ডধারী বিচারক। একদিন অত্যাচারে পীড়িত হইয়া দ্রুতবেগে ইঁহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আসামি ছিল পাঁচ-ছয়জন বড়ো বড়ো ছেলে; আমার পক্ষে সাক্ষী কেহই ছিল না। সাক্ষীর মধ্যে ছিল আমার অশ্রুজল। সেই ফৌজদারিতে আমি জিতিয়াছিলাম এবং সেই পরিচয়ের পর হইতে গোবিন্দবাবু আমাকে করুণার চক্ষে দেখিতেন।

একদিন ছুটির সময় তাঁহার ঘরে আমার হঠাৎ ডাক পড়িল। আমি ভীত-চিত্তে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি কবিতা লেখ।" কবুল করিতে ক্ষণমাত্র দ্বিধা করিলাম না। মনে নাই কী একটা উচ্চ অঙ্গের সুনীতি সম্বন্ধে তিনি আমাকে কবিতা লিখিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। গোবিন্দবাবুর মতো ভীষণগম্ভীর লোকের মুখ হইতে কবিতা লেখার এই আদেশ যে কীরূপ অদ্ভুত সুললিত, তাহা যাঁহারা তাঁহার ছাত্র নহেন তাঁহারা বুঝিবেন না। পরদিন লিখিয়া

যখন তাঁহাকে দেখাইলাম তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ছাত্রবৃত্তির ক্লাসের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিলেন। বলিলেন, "পড়িয়া শোনাও।" আমি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া গেলাম।

এই নীতিকবিতাটির প্রশংসা করিবার একটিমাত্র বিষয় আছে — এটি সকাল - সকাল হারাইয়া গেছে। ছাত্রবৃত্তি-ক্লাসে ইহার নৈতিক ফল যাহা দেখা গেল তাহা আশাপ্রদ নহে। অন্তত, এই কবিতার দ্বারায় শ্রোতাদের মনে কবির প্রতি কিছুমাত্র সদ্‌ভাবসঞ্চার হয় নাই। অধিকাংশ ছেলেই আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, এ লেখা নিশ্চয় আমার নিজের রচনা নহে। একজন বলিল, যে ছাপার বই হইতে এ লেখা চুরি সে তাহা আনিয়া দেখাইয়া দিতে পারে। কেহই তাহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল না। বিশ্বাস করাই তাহাদের আবশ্যক — প্রমাণ করিতে গেলে তাহার ব্যাঘাত হইতে পারে। ইহার পরে কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তাহারা যে-পথ অবলম্বন করিল তাহা নৈতিক উন্নতির প্রশস্ত পথ নহে।

এখনকার দিনে ছোটোছেলের কবিতা লেখা কিছুমাত্র বিরল নহে। আজকাল কবিতার গুমর একেবারে ফাঁক হইয়া গিয়াছে। মনে আছে, তখন দৈবাৎ যে দুই-একজনমাত্র স্ত্রীলোক কবিতা লিখিতেন তাঁহাদিগকে বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি বলিয়া সকলে গণ্য করিত। এখন যদি শুনি, কোনো স্ত্রীলোক কবিতা লেখেন না, তবে সেইটেই এমন অসম্ভব বোধ হয় যে, সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। কবিত্বের অঙ্কুর এখনকার কালে উৎসাহের অনাবৃষ্টিতেও ছাত্রবৃত্তি-ক্লাসের অনেক পূর্বেই মাথা তুলিয়া উঠে। অতএব, বালকের যে কীর্তিকাহিনি এখানে উদ্‌ঘাটিত করিলাম, তাহাতে বর্তমানকালের কোনো গোবিন্দবাবু বিস্মিত হইবেন না।

নিয়মের রাজত্ব

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
(১৮৬৪-১৯১৯)

বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য, এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানসম্পৃক্ত যে-কোনো গ্রন্থ হাতে করিলেই দেখা যাইবে যে, লেখা রহিয়াছে, প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই; সর্বত্রই নিয়ম, সর্বত্রই শৃঙ্খলা। ভূতপূর্ব আর্গাইলের ডিউক নিয়মের রাজত্ব সম্পর্কে একখানা বৃহৎ কেতাব লিখিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের রাজ্যে আইন আছে বটে, এবং সেই আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে; কিন্তু অনেকেই আইনকে ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু বিশ্বজগতে অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে যে সকল আইনের বিধান বর্তমান, তাহার একটাকেও ফাঁকি দিবার জো নাই। কোথাও ব্যভিচার নাই, কোথাও ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভের উপায় নাই। কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত হন, ভাবাবেশে গদগদকণ্ঠ হইয়া থাকেন; তাঁহাদের দেহে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়।

যাঁহারা মিরাকল বা অতিপ্রাকৃত মানেন, তাঁহারা সকল সময় এই নিয়মের অব্যভিচারিতা স্বীকার করেন না, অথবা প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্ব স্বীকার করিলেও অতিপ্রাকৃত শক্তি সময়ে সময়ে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ স্বীকার করেন। যাঁহারা মিরাকল মানিতে চাহেন না, তাঁহারা প্রতিপক্ষকে মিথ্যাবাদী নির্বোধ পাগল ইত্যাদি মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করেন। কখনও বা উভয় পক্ষে বাগ্‌যুদ্ধের পরিবর্তে বাহুযুদ্ধের অবতারণা হয়।

বর্তমান অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে নতুন করিয়া গম্ভীরভাবে একটা সন্দর্ভ লিখিবার সময় গিয়াছে, এরূপ না মনে করিলেও চলিতে পারে।

প্রাকৃতিক নিয়ম কাহাকে বলে? দুই একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতে পারে। গাছ হইতে ফল চিরকালই ভূমিপৃষ্ঠে পতিত হয়। এ পর্যন্ত যত গাছ দেখা গিয়াছে ও যত ফল দেখা গিয়াছে, সর্বত্রই এই নিয়ম। যে দিন লোষ্ট্রপাতিত আম্র ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সেই ভয়াবহ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।

ফলে আম বল, জাম বল, নারিকেল বল, সকলেই অধোমুখে ভূমিতে পড়ে, কেহই ঊর্ধ্বমুখে আকাশপথে চলে না। কেবল আম জাম নারিকেল কেন, যে-কোনো দ্রব্য ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপ কর না, তাহাই কিছুক্ষণ পরে ভূমিতে নামিয়া আসে। এই সাধারণ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই।

অতএব ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। পার্থিব দ্রব্য-মাত্রই ভূকেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতে চাহে। এই নিয়মের নাম ভৌম আকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ।

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না; কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, দেখিয়া আসিলাম, অমুকের গাছের নারিকেল আজ বৃন্তচ্যুত হইবা মাত্র ক্রমেই বেলুনের মতো উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে — লোকটা মিথ্যাবাদী; কেহ বলিবে — লোকটা পাগল; কেহ বলিবে — লোকটা গুলি খায়; এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ন নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি হয়তো বলিবেন, হইতেও বা পারে, বুঝি ওই নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল। কেন না, তাঁহার ধ্রুব বিশ্বস যে, নারিকেল — খাঁটি নারিকেল, যাহার ভিতরে জল আছে, হাইড্রোজেন নাই, এ-হেন নারিকেল কখনোই প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গে অপরাধী হইতে পারে না।

খাঁটি নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ করে না বটে, তবে হাইড্রোজেনপূর্ণ বোম্বাই নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে; আম ভূমিতে পড়ে, কিন্তু মেঘ বায়ুতে ভাসে; প্যারাসুট-বিলম্বিত আরোহী নীচে নামে বটে, কিন্তু বেলুন উপরে উঠে।

তবে এইখানে বুঝি নিয়ম ভঙ্গ হইল। পর্বে এক নিশ্বাসে নিয়ম বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, পার্থিব দ্রব্য মাত্রেই নিম্নগামী হয়; কিন্তু এখানে দেখিতেছি, নিয়মের ব্যভিচার আছে; যথা মেঘ, বেলুন ও হাইড্রোজেন-পোরা বোম্বাই

নারিকেল। লোহা জলে ডুবে, কিন্তু শোলা জলে ভাসে। কাজেই প্রকৃতির নিয়মে এইখানে ব্যভিচার।

অপর পক্ষ হঠিবার নহেন; তাঁহারা বলিবেন, তা কেন, নিয়ম ঠিক আছে, পার্থিব দ্রব্য মাত্রেই নীচে নামে, এরূপ নিয়ম নহে। দ্রব্যমধ্যে জাতিভেদ আছে। গুরু দ্রব্য নীচে নামে, লঘু দ্রব্য উপরে উঠে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। লোহা গুরু দ্রব্য, তাই জলে ডুবে; শোলা লঘু দ্রব্য, তাই জলে ভাসে; ডুবাইয়া দিলেও উপরে উঠে। নারিকেল গুরু দ্রব্য; উহা নামে। কিন্তু বেলুন লঘু দ্রব্য; উহা উঠে।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুঁজিয়া বাহির করা বস্তুতই কঠিন। কার সাধ্য ঠকায়? ওই জিনিসটা উপরে উঠিতেছে কেন? উত্তর, এটা যে লঘু। ওই জিনিসটা নামিতেছে কেন? উত্তর, ওটা যে গুরু। যাহা লঘু, তাহা তো উঠিবেই; যাহা গুরু, তাহা তো নামিবেই; ইহাই তো প্রকৃতির নিয়ম।

সোজা পথে আর উত্তর দিতে পারা যায় না; বাঁকা পথে যাইতে হয়। লোহা গুরু দ্রব্য; কিন্তু খানিকটা পারার মধ্যে ফেলিলে লোহা ডুবে না। ভাসিতে থাকে। শোলা লঘু দ্রব্য; কিন্তু জল হইতে তুলিয়া ঊর্ধ্বমুখে নিক্ষেপ করিলে ঘুরিয়া ভূতলগামী হয়। তবেই তো প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হইল।

উত্তর — আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝিলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে বা মন্ত্রদাতা গুরুও নহে; গুরু অর্থে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী। লোহা গুরু, তার অর্থ এই যে, লোহা বায়ু অপেক্ষা গুরু, জল অপেক্ষা গুরু; কাজেই বায়ুমধ্যে, কি জলমধ্যে রাখিলে লোহা না ভাসিয়া ডুবিয়া যায়। আর লোহা পারার অপেক্ষা লঘু; সমান আয়তনের লোহা ও পারা নিক্তিতে ওজন করিলেই দেখিবে, কে লঘু, কে গুরু। পারা অপেক্ষা লোহা লঘু, সে জন্য লোহা পারায় ভাসে। প্রাকৃতিক নিয়মটার অর্থই বুঝিলে না, কেবল তর্ক করিতে আসিতেছ!

এ পক্ষ বলিতে পারেন, আপনার বাক্যের অর্থ যদি বুঝিতে না পারি, সে তো আমার বুদ্ধির দোষ নহে; আপনার ভাষার দোষ। গুরু দ্রব্য নামে, লঘু দ্রব্য উঠে, বলিবার পূর্বে গুরু লঘু কাহাকে বলে, আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। আপনার আইনের ভাষা যোজনায় দোষ ঘটিয়াছে; উহার সংশোধন আবশ্যক।

যা সংশোধনের পর প্রাকৃতিক আইনের সংশোধিত ধারাটা দাঁড়াইবে এইরকম :

ধারা। — কোনো দ্রব্য অপর তরল বা বায়বীয় দ্রব্যমধ্যে রাখিলে প্রথম দ্রব্য যদি দ্বিতীয় দ্রব্য অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে নিম্নগামী হইবে, আর যদি লঘু হয়, তাহা হইলে ঊর্ধ্বগামী হইবে।

ব্যাখ্যা। — এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য অপেক্ষা গুরু কি লঘু, তাহা উভয়ের সমান আয়তন লইয়া নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে হইবে।

উদাহরণ — রাম প্রথম দ্রব্য, শ্যাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের আয়তন মতো ছাঁটিয়া লইয়া তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখ, রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে শ্যামের মধ্যে রামকে রাখিলে রাম নিম্নগামী হইবে। শ্যামকে তরল পদার্থ মনে করিতে আপত্তি করিও না।

সংশোধনের পর আইনের ভাষা অত্যন্ত সুবোধ্য হইয়া দাঁড়াইল, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

এখন দেখা যাউক, কত দূর দাঁড়াইল। পার্থিব দ্রব্য মাত্রই ভূমি স্পর্শ করিতে চাহে, নিম্নগামী হয়; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। সুতরাং উহার ব্যভিচার দেখিলে বিস্মিত হইবার হেতু নাই; পার্থিব দ্রব্য অবস্থাবিশেষে, অর্থাৎ অন্য পার্থিব বস্তুর সন্নিধানে, কখনও বা উপরে উঠে, কখনও বা নীচে নামে। যখন অন্য কোনো বস্তুর সন্নিধানে থাকে না, তখন সকল পার্থিব দ্রব্য নীচে নামে। যেমন শূন্য প্রদেশে, পাম্পযোগে কোনো প্রদেশকে জলশূন্য ও বায়ুশূন্য করিয়া সেখানে যে-কোনো দ্রব্য রাখিবে, তাহাই নিম্নগামী হইবে। আর বায়ুমধ্যে, জলমধ্যে, তেলের মধ্যে, পারদমধ্যে কোনো জিনিস রাখিলে তখন লঘু-গুরু বিচার করিতে হইবে। ফলে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; ইহার ব্যভিচার নাই। এই অর্থে প্রকৃতি নিয়ম অলঙ্ঘ্য।

তবে যত দোষ এই জলের আর তেলের আর পারার আর বাতাসের। উহাদের সন্নিধিই এই বিষম সংশয় উৎপাদনের হেতু হইয়াছিল। ভাগ্যে মনুষ্য বুদ্ধিজীবী, তাই প্রকৃত দোষীর সন্ধান করিতে পারিয়াছে; নতুবা প্রকৃতিতে নিয়মের প্রভুত্বটা গিয়াছিল আর কী!

বাস্তবিকই দোষ এই তরল পদার্থের ও বায়বীয় পদার্থের। বেলুন উপরে উঠে, বায়ু আছে বলিয়া; শোলা জলে ভাসে, জল আছে বলিয়া; লোহা পারায় ভাসে, পারা আছে বলিয়া; — নতুবা সকলেই ডুবিত, কেহই ভাসিত না; সকলেই নামিত, কেহই উঠিত না।

অর্থাৎ কি না, পৃথিবী যেমন সকল দ্রব্যকেই কেন্দ্রমুখে আনিতে চায়, তরল ও বায়বীয় পদার্থ মাত্রেই তেমনই মগ্ন দ্রব্য মাত্রকেই উপরে তুলিতে চায়। প্রথম ব্যাপারের নাম দিয়াছি মাধ্যাকর্ষণ; দ্বিতীয় ব্যাপারের নাম দাও চাপ। মাধ্যাকর্ষণে নামায়, চাপে ঠেলিয়া উঠায়। যেখানে উভয় বর্তমান, সেখানে উভয়ই কার্য করে। যার যত জোর। যেখানে আকর্ষণ চাপ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর নামিতে হয়; যেখানে চাপ আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটর উপর উঠিতে হয়। যেখানে উভয়ই সমান, সেখানে "ন যযৌ ন তস্থৌ"।

এখন এ পক্ষ স্পর্ধা করিয়া বলিবেন, — দেখিলে, প্রাকৃতিক নিয়মের আর ব্যতিক্রম আছে কি? আমাদের প্রকৃতির রাজ্যে কি কেবল একটা নিয়ম; কেবলই কি একটা আইন? অনেক নিয়ম ও অনেক আইন, অথবা একই আইনের অনেক ধারা। যথা —

১ নং ধারা — পার্থিব আকর্ষণে বস্তু মাত্রই নিম্নগামী হয়।

২ নং ধারা — তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তু মাত্রই ঊর্ধ্বগামী হয়।

৩ নং ধারা — আকর্ষণ ও চাপ উভয়ই যুগপৎ কাজ করে। আকর্ষণ প্রবল হইলে নামায়, চাপ প্রবল হইলে উঠায়।

কাহার সাধ্য, এখন বলে যে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার আছে? উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম; নিয়ম কাটাইবার জো নাই। প্রকৃতির রাজ্য বস্তুতই নিয়মের রাজ্য। নারিকেল-ফল যে নিয়িম লঙ্ঘন করে না, তাহা যেদিন হইতে নারিকেল-ফল মনুষ্যের ভক্ষ্য হইয়াছে, তদবধি সকলেই জানে। বেলুন যে ঊর্ধ্বগামী হইয়াও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিল না, তাহাও দেখা গেল। কেন না, পৃথিবীর আকর্ষণ উভয় স্থলেই বিদ্যমান।

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মটা কীরূপ, তাহা কতক বোঝা গেল। তুমি সোজা চলিতেছ,

ভালো, উহাই নিয়ম; বাঁকা চলিতেছে, বেশ কথা, উহাই নিয়ম। তুমি হাসিতেছ, ঠিক নিয়মানুযায়ী; কাঁদিতেছে, তাহাতেও নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। যাহা ঘটে, তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়মের ব্যভিচারের আর অবকাশ থাকিল কোথায়? কোনো নিয়ম সোজা; কোনো নিয়ম বা খুব জটিল। কোনোটাতে বা ব্যভিচার দেখি না; কোনোটাতে বা ব্যভিচার দেখি; কিন্তু বলি, ওইখানে ওই ব্যভিচার থাকাই নিয়ম। কাজেই নিয়মের রাজ্য ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই।

ফলে জাগতিক ঘটনা পরম্পরার মধ্যে কতকগুলো সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটনাগুলা একেবারে অসম্বন্ধ বা শৃঙ্খলাশূন্য নহে। মানুষ যত দেখে, যত সূক্ষ্ম ভাবে দেখে, যত বিচার করিয়া দেখে, ততই বিবিধ সম্বন্ধের আবিষ্কার করিয়া থাকে। বহু কাল হইতে মানুষে দেখিয়া আসিতেছে, সূর্য পূর্বে উঠে, নারিকেল ভূমিতে পড়ে, কাষ্ঠরূপী ইন্ধনযোগে প্রাকৃত অগ্নি উদ্দীপিত হয়, আর অন্নরূপী ইন্ধনযোগে জঠরাগ্নি নির্বাপিত হয়। এই সকল ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ মনুষ্য বহুকাল হইতে জানে। আলোক ও তাড়িত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির সম্পর্কে নানা তথ্য, বিবিধ ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ, মনুষ্য অল্প দিন মাত্র জানিয়াছে। যত দেখে, ততই শেখে, ততই জানে; যতক্ষণ কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ-সীমায় না আইসে, ইন্দ্রিয়গোচর না হয়, ততক্ষণ তাহা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। ইন্দ্রিয়গোচর হইলেই তৎসম্পর্কে একটা নূতন তথ্যের আবিষ্কার হয়। কিন্তু পূর্ব হইতে কে বলিতে পারে, কালি কোন্ নূতন নিয়মের আবিষ্কার হইবে? বিংশ শতাব্দীর শেষে মনুষ্যের জ্ঞানের সীমানা কোথায় পৌঁছিবে, আজ তাহা কে বলিতে পারে?

শুভ উৎসব

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৭০-১৮৯৯)

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আর যাহাই হউক, আমাদের পুরাতন বিচিত্র উৎসব-কলা যে ক্রমশ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নাই। এখনকার উৎসবগুলি ক্রমশই যেন আপিসি ছাঁদে গঠিত হইয়া উঠিতেছে — তাহার মধ্যে দেনাপাওনা হিসাবপত্রের হাঙ্গামা যত অধিক, আনন্দ আর সে পরিমাণে নাই। পূর্বে যে দেনাপাওনার সম্বন্ধ আদৌ ছিল না তাহা নহে, এবং হয়তো সূক্ষ্ম রূপে বিচার করিয়া দেখিলে আর্থিক সম্বন্ধ তখনও এখনকার মতো প্রবল ছিল, কিন্তু অন্য প্রকার সম্বন্ধের আবরণে এই হিসাবি সম্বন্ধটা তখন কোথাও বড়ো প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর পাইয়া উঠে নাই। ব্রাহ্মণ ফলাহারের পর দক্ষিণা না লইয়া বাড়ি ফিরিতেন না, কিন্তু দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এমন একটি মধুর সম্বন্ধ ছিল যে, দক্ষিণার আর্থিকতা তাহার মধ্যে স্থান পাইত না। মন্ত্রপাঠের ব্রাহ্মণ হইতে শুরু করিয়া কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, হাঁড়ি, ডোম পর্যন্ত সকলেরই নিজ নিজ মর্যাদানুসারে উৎসবাঙ্গে স্থান নির্দিষ্ট ছিল — কাহাকেও বাদ দিলে চলিত না।

কিন্তু এখন ইংরেজি পণ্যশালার অনুগ্রহে যান্ত্রিকভাবেই অনেক কার্য নিঃশব্দে সমাধা হইয়া উঠে। এক কলমের আঁচড়ে হ্যারিসন হ্যাথাওয়ে, হোয়াইট্যাওয়ে লেড্‌ল, অস্‌লর, ল্যাজারাসের ভবন হইতে যাহা কিছু আবশ্যক আনাইয়া লওয়া যায়; এমনকি নাপিত, পাচক পরিবেশকাদিও সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু আমাদের পণ্যক্রিয়ার মধ্যে সজীব সহৃদয় মনুষ্যত্বের মধুর সংস্পর্শে যে একটি নিগূঢ় আনন্দ ছিল, ইহাতে সেটুকু দিতে পারে না স্বীকার করিতে হয়। — তখনকার দিনে বড়োলোকের বাটীতে কোনো ক্রিয়াকর্মোপলক্ষ্যে মাসেককাল পূর্ব হইতে নানাবিধ

পণ্যভার লইয়া দোকানি-পসারিরা গতিবিধি শুরু করিত। শালওয়ালা ভালো ভালো কাশ্মীরি শাল ও রুমাল লইয়া আসিত, মুর্শিদাবাদ ও ঘাটাল অঞ্চলের বণিকেরা নানাবিধ গরদ, তসর ও রেশমি বস্ত্র আমদানি করিত। ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, সিমলার ব্যাপারীরা কত প্রকারের সূক্ষ্ম ও বিচিত্রপাড় কার্পাস বস্ত্র এবং পশ্চিমি ক্ষেত্রীরা বেনারসি ও চেলির জোড় লইয়া উপস্থিত হইত। এতদ্ভিন্ন, স্বর্ণকার কর্মকার মালাকার ময়রা গোয়ালা পাথরওয়ালা কাংস্য-পিত্তলবিক্রেতা — নানান জনে নানাবিধ ফরমাসে নিত্য গতায়াত করিত। এমনকি, বেদানার বস্তা লইয়া বিদেশি কাবুলিওয়ালা পর্যন্ত বাদ যাইত না। কিন্তু এ গতিবিধি নিতান্তই বাহিরের লোকের মতো ছিল না, এবং এই খরিদ-বিক্রয়টুকুর মধ্যেই তাহাদের সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হইয়া যাইত না, সকলেই উৎসাহসহকারে উৎসবের নানাবিধ অনুষ্ঠান-বিষয়ে পাঁচটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত, মন্তব্য দিত, প্রশ্ন করিত, কোথায় কী হইবে না-হইবে দেখিয়া-শুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, কাজের দিনে বাড়ির ছোটো ছোটো ছেলেপুলেগুলিকে লইয়া উৎসব দেখিতে আসিত, এবং পুরাতন কাবুলিওয়ালা তাহার শখের জরির কোর্তা গায়ে দিয়া প্রসন্নমুখে দ্বারদেশে আসিয়া প্রহরী হইয়া দাঁড়াইত। নিতান্ত জড়-বিনিময় মাত্র না হইয়া আমার তাহাদের পণ্যসামগ্রীর সহিত অন্তরের শুভ প্রীতিও অনেকখানি করিয়া লাভ করিতাম, এবং মুদ্রাখণ্ডের সহিত উৎসবের ভাগও কতক পরিমাণে দিতাম। এই যে অন্তরে অন্তরে 'ফাউ' আদান-প্রদানটুকু, ইহাতেই বিশেষ আনন্দ এবং এইটুকুর জন্য আমাদের মধ্যে আর্থিক সম্বন্ধে হীনতা সহজে দেখা যাইত না।

কেবলই যে বাহিরে বাহিরে এইরূপ গতিবিধি ও আদান-প্রদান ছিল তাহাও নহে। অন্তঃপুরে কুম্ভকারপত্নী নতুন বরণডালা সাজাইয়া আনিয়া দিত, মালিনী নিত্য নব নব ফুলভার জোগাইত এবং ফুলসজ্জার জন্য নতুন নতুন ফুলের গহনা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিত, নাপতানি দিদি ঠাকুরানি ও বধূঠাকুরানিদিগের কোমল পদপল্লবে ঝামা ঘষিয়া আলতা পরাইয়া দিয়া যাইত, তাঁতিনি নূতন নূতন পাড়ের মনোহারিণী নীলাম্বরী ও বিচিত্র বর্ণের শাটিকা লইয়া আসিত। গোয়ালিনি মধ্যাহ্নভোজনান্তে, আর কিছু না হউক, গোয়ালপাড়ার দুইটি মন্তব্য শুনাইয়া যাইত এবং পাড়ার বৃদ্ধা ব্রাহ্মণঠাকুরানি স্বহস্তকর্তিত কয়গাছি পইতার সুতা আনিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া গল্প করিতে বসিতেন। এই এতগুলি বর্ষীয়সী ও যুবতি- সমাগম যে নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে সাধিত হইত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। হাস্যপরিহাস, গল্পগুঞ্জন, সমলোচনা,

বিধিব্যবস্থা নির্ধারণ ও নানা অনাবশ্যক উপদেশ পরামর্শ বিচার প্রসঙ্গে বয়স ও অবস্থার তারতম্য ঘুচিয়া গিয়া সকলের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও সরস হইয়া উঠিত — দেনা-পাওনার সম্বন্ধটুকু আদৌ প্রকাশ পাইত না। সকলেই যেন আত্মীয়-পরিজনবর্গের মধ্যে — যেন একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের নানা অঙ্গ।

এইরূপে আমাদের প্রত্যেকের কোনো শুভানুষ্ঠানের মধ্যে অলক্ষিতে এই এতগুলি লোকের শুভকামনা কার্য করিত, এবং ইহাতেই আমাদের সামান্য ক্রিয়াকর্মও বৃহৎ উৎসবে পরিণত হইত। নব্যতন্ত্র রজতচক্রকে যেরূপ সকল সম্বন্ধের মধ্যবিন্দু করিয়া তুলিতে চাহে, তখন তাহা ছিল না। ধনের পদমর্যাদা যথেষ্ট থাকিলেও গৌরবকে, প্রীতির সম্বন্ধকে সে লঙ্ঘন করিতে পারিত না। এমনকি, বেতনভুক সামান্য দাস-দাসীদিগকেও সংসারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে দেখা হইত, এবং সুগৃহিণী ইহাদের কেহ ক্ষুধিত থাকিতে নিজের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। এই যে হৃদ্যতাটুকু — এই যে ব্যথার ব্যথী ভাব — ইহা আর কিছুতেই থাকে না। পূর্বে যেখানে প্রীতিসূচক আত্মীয়তাই স্বাভাবিক ছিল, এক্ষণে সেখানে নিকট সম্বন্ধ স্থাপনেই অনেক সময়ে অত্যন্ত অশোভন ও অসংগত বলিয়া ঠেকে। আশ্রিতজন এক্ষণে পূর্বের ন্যায় হৃদয়ের আশ্রয় আর বড়ো পায় না, এবং আশ্রয়দাতাও তাহাদের হৃদয়ের অধীশ্বরত্ব হইতে বঞ্চিত হয়েন। অন্তরে-অন্তরে কাহারও সহিত কাহারও কোনোরূপ অনিবার্য যোগ নাই।

আমাদের উৎসবে এই অন্তরেরই প্রথম প্রতিষ্ঠা। সমারোহসহকারে আমোদ-প্রমোদ করায় আমাদের উৎসবকলা কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় না। কিন্তু তাহার মধ্যে সর্বজনের আন্তরিক প্রসন্নতা ও শুভ ইচ্ছাটুকু না থাকিলে নয়। উৎসব প্রাঙ্গণ হইতে সামান্য ভিক্ষুকও যদি ম্লানমুখে ফিরিয়া যায়, শুভ উৎসব যেন একান্ত ক্ষুণ্ণ হয়। যাত্রা হউক, কথা হউক, রামায়ণ গান হউক বা চণ্ডীপাঠ হউক, — যখন যাহা হয় উন্মুক্ত গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া সর্বসাধারণে তাহাতে অকাতরে যোগদান করে, এবং সকলের সহিত একত্র হইয়া গৃহকর্তা তাহা উপভোগ করেন।

যাহাতে আমার নিজের কিছুমাত্র আনন্দ আছে, সেই আনন্দটুকু যখন দশজনের মধ্যে বিতরণ করিতে চাহি, তখন উপলক্ষ্যের অভাব ঘটিবার কোনো কারণ দেখা যায় না। আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক আমার শুভে সকলের শুভ হউক,

আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি — এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ। অনেক ছোটোখাটো বিষয়েও আমি হয়তো একটুকু আনন্দ পাই — নিজের বাড়িখানি হইলে সুখী হই, পুষ্করিণীটি থাকিলে ভালো লাগে, গোরুগুলির কল্যাণ কামনা করি — গৃহপ্রবেশ, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, গোষ্ঠাষ্টমী — এইরূপ এক একটি উৎসব উপলক্ষ্যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, পোষ্যপরিজন, দীনদুঃখীকে আহ্বান করিয়া যথাসাধ্য সৎকারে আমার সুখের ভাগী করিতে চাহি। আমি যে একজন গৃহহীনকে আশ্রয় দিতে পারি, তৃষ্ণার্তের পিপাসা নিবারণ করিতে পারি, অবোলা জীবদের কিছুমাত্র সুখবিধান করিতে সমর্থ হই, আমার এ সৌভাগ্য যেন সকলের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহে। সাবিত্রী-ব্রত, জামাইষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে আপন প্রিয়জন ও স্নেহাস্পদগণকে সৎকার করিয়া নিজেকে ধন্য মনে হয়; বিধাতা আমাকে যে এত সৌভাগ্যসুখ দিয়াছেন তাহা সকলের সহিত বণ্টন করিয়া না লইলে ইহার সফলতা কোথায়? উৎসব ইহারই উপলক্ষ্য। সেইজন্য আমাদের উৎসবে ভাবের প্রাধান্য — বাহিরের সমারোহ তাহার প্রধান অঙ্গ নহে। পতিব্রতা স্ত্রীর হাতের সামান্য লোহা ও মাথার সিন্দূর যেমন আমাদের মনে একটি অনির্বচনীয় লক্ষ্মীশ্রী সূচিত করিয়া দেয়, নেত্রঝলসানো অলংকাররাজি তাহা পারে না, — প্রীতি-বিকশিত উৎসবের সামান্য মঙ্গলঘট ও চূতপল্লবগুচ্ছ সেইরূপ আমাদের অন্তরে একটি শিবসুন্দর ভাব সঞ্চারিত করিয়া তুলে, সহস্র তড়িতালোক ও বিলাস উৎসব সে শুভ কমনীয়তা সঞ্চার করিতে পারে না। বিলাসের মণিমুক্তা আমাদের বাহিরে ঐশ্বর্যের পরিচায়ক মাত্র, কিন্তু উৎসবের ধান্যদূর্বামুষ্টি অন্তরের অকৃত্রিম শুভকামনার বাহ্য চিহ্ন। ইহার সহিত ধনীর রত্নভাণ্ডারের তুলনা সম্ভব নহে। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের মতো ইহার মধ্যে যেন কেমন একটি অক্ষুণ্ণ শুচিতা আছে — বাহ্যাড়ম্বর-বাহুল্যের তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই।

নতুনদা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(১৮৭৬-১৯৩৮)

সেদিন কনকনে শীতের সন্ধ্যা। আগের দিন খুব এক পশলা বৃষ্টিপাত হওয়ায়, শীতটা যেন ছুঁচের মতো গায়ে বিঁধিতেছিল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। চারিদিক জ্যোৎস্নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ ইন্দ্র আসিয়া হাজির। কহিল, — তে থিয়াটার হবে, যাবি? থিয়েটারের নামে একেবারেই লাফাইয়া উঠিলাম। ইন্দ্র কহিল, তবে কাপড় পরে শিগগির আমাদের বাড়ি আয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখানা র‍্যাপার টানিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম। সেখানে যাইতে হইলে ট্রেনে যাইতে হয়। ভাবিলাম, উহাদের বাড়ির গাড়ি করিয়া স্টেশনে যাইতে হইবে — তাই তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্র কহিল, তা নয়। আমরা ডিঙিতে যাব। আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। কারণ গঙ্গায় উজান ঠেলিয়া যাইতে হইলে বহু বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। হয়তো বা সময়ে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে না। ইন্দ্র কহিল, ভয় নেই, জোর হাওয়া আছে; দেরি হবে না। আমার নতুনদা কলকাতা থেকে এসেছেন, তিনি গঙ্গা দিয়ে যেতে চান।

যাক, দাঁড় বাঁধিয়া পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়াছি — অনেক বিলম্বে ইন্দ্রর নতুনদা আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন। চাঁদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু — অর্থাৎ ভয়ংকর বাবু। সিল্কের মোজা, চকচকে পাম্পশু, আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি — পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত 'যাচ্ছেতাই' বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রর কাঁধে ভর দিয়া আমার হাত ধরিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

তোর নাম কী রে?

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, শ্রীকান্ত।

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, আবার শ্রী-কান্ত—! শুধু কান্ত। নে, তামাক সাজ। ইন্দ্র, হুঁকো-কলকে রাখলি কোথায়? ছোঁড়াটাকে দে — তামাক সাজুক!

ওরে বাবা! মানুষ চাকরকেও তো এমন বিকট ভঙ্গি করিয়া আদেশ করে না! ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর, আমি তামাক সাজচি।

আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম। কারণ তিনি ইন্দ্রর মাসতুতো ভাই, কলিকাতার অধিবাসী এবং সম্প্রতি এল এ পাস করিয়াছেন। কিন্তু মনটা আমার বিগড়াইয়া গেল। তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে দিতে, তিনি প্রসন্নমুখে টানিতে টানিতে প্রশ্ন করিলেন, তুই থাকিস কোথায় রে কান্ত? তোর গায়ে ওটা কালোপানা কী রে? র‍্যাপার? আহা, র‍্যাপারের কী শ্রী। তেলের গন্ধে ভূত পালায়। ফুটচে — পেতে দে দেখি, বসি।

আমি দিচ্ছি নতুনদা। আমার শীত করছে না — এই নাও, বলিয়া ইন্দ্র নিজের গায়ের আলোয়ানটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিনি সেটা জড়ো করিয়া লইয়া বেশ করিয়া বসিয়া সুখে তামাক টানিতে লাগিলেন।

শীতের গঙ্গা। অধিক প্রশস্ত নয়। আধঘণ্টার মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়া ভিড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল।

ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, নতুনদা এ যে ভারী মুশকিল হল, হাওয়া পড়ে গেল। আর তো পাল চলবে না।

নতুনদা জবাব দিলেন, এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক। কলিকাতাবাসী নতুনদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল, দাঁড়! কারুর সাধ্যি নেই নতুনদা, এই রেত ঠেলে উজোন বয়ে যায়। আমাদের ফিরতে হবে।

প্রস্তাব শুনিয়া, নতুনদা এক মুহূর্তেই একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন, তবে আনলি কেন হতভাগা! যেমন করে হোক তোকে পৌঁছে দিতেই হবে। আমায় থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতেই হবে — তারা বিশেষ করে ধরেছে। ইন্দ্র কহিল,

তাদের বাজাবার লোক আছে নতুনদা। তুমি না গেলেও আটকাবে না।

না! আটকাবে না? এই মেড়োর দেশের ছেলেরা বাজাবে হারমোনিয়াম! চল, যেমন করে পারিস নিয়ে চল। বলিয়া তিনি যেরূপ মুখভঙ্গি করিলেন, তাহাতে আমার গা জ্বলিয়া গেল। ইহার বাজনা পরে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু সে কথায় আর প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্রর অবস্থা-সংকট অনুভব করিয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম, ইন্দ্র, গুন টেনে নিয়ে গেলে হয় না? কথাটা শেষ হইতে না হইতেই আমি চমকাইয়া উঠিলাম। তিনি এমনি দাঁতমুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন যে, সে মুখখানি আমি আজও মনে করিতে পারি। বলিলেন, তবে যাও না, টানো গে না হে। জানোয়ারের মতো বসে থাকা হচ্ছে কেন?

তার পরে একবার ইন্দ্র, একবার আমি গুন টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনও বা উঁচু পাড়ের উপর দিয়া কখনও বা নীচে নামিয়া এবং সময়ে সময়ে সেই বরফের মতো ঠান্ডা জলের ধার ঘেঁষিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া চলিতে হইল। আবার তারই মাঝে মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্য নৌকা থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন — এতটুকু সাহায্য করিলেন না। ইন্দ্র একবার তাঁহাকে হালটা ধরিতে বলায় জবাব দিলেন, তিনি দস্তানা খুলে এই ঠান্ডায় নিমোনিয়া করিতে পারিবেন না। ইন্দ্র বলিতে গেল, না খুলে —

হ্যাঁ, দামি দস্তানাটা মাটি করে ফেলি আর কি! নে — যা করছিস কর।

বস্তুত আমি এমন স্বার্থপর, অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। তাঁরই একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের এত ক্লেশ সমস্ত চোখে দেখিয়াও তিনি এতটুকু বিচলিত হইলেন না। অথচ আমরা বয়সে তাঁহার অপেক্ষা কতই বা ছোটো ছিলাম! পাছে এতটুকু ঠান্ডা লাগিয়া তাঁহার অসুখ করে, পাছে একফোঁটা জল লাগিয়া দামি ওভার-কোট খারাপ হইয়া যায়, পাছে নড়িলে চড়িলে কোনোরূপ ব্যাঘাত হয়, এই ভয়েই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন, এবং অবিশ্রাম চেঁচামেচি করিয়া হুকুম করিতে লাগিলেন।

আরও বিপদ গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুধার উদ্রেক হইল এবং দেখিতে দেখিতে সে ক্ষুধা অবিশ্রান্ত বকুনির চোটে একেবারে ভীষণ হইয়া উঠিল। এদিকে

চলিতে চলিতে রাত্রিও প্রায় দশটা হইয়া গেছে — থিয়েটারে পৌঁছিতে রাত্রি দুটা বাজিয়া যাইবে শুনিয়া, বাবু প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। রাত্রি যখন এগারোটা, তখন কলিকাতার বাবু কাবু হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ রে ইন্দ্র, এদিকে খোট্টামোট্টাদের বস্তি-টস্তি নেই? মুড়ি-টুড়ি পাওয়া যায় না?

ইন্দ্র কহিল, সামনেই একটা বেশ বড়ো বস্তি নতুনদা। সব জিনিস পাওয়া যায়।

তবে লাগা লাগা — ওরে ছোঁড়া — ঐ — টান না একটু জোরে — ভাত খাসনে? ইন্দ্র বল না তোর ওই ওটাকে, একটু জোর করে টেনে নিয়ে চলুক।

ইন্দ্র কিংবা আমি কেহই তাহার জবাব দিলাম না। যেমন চলিতেছিলাম, তেমনি ভাবেই অনতিকাল পরে একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে পাড়টা ঢালু ও বিস্তৃত হইয়া জলে মিশিয়াছিল। ডিঙি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সংকীর্ণ জলে তুলিয়া দিয়া আমরা দুজনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাবু কহিলেন, হাত-পা একটু খেলানো চাই। নাবা দরকার। অতএব ইন্দ্র তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নামাইয়া আনিল। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে গঙ্গার শুভ্র সৈকতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

আমরা দুজনে তাঁহার ক্ষুধাশান্তির উদ্দেশে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম। যদিচ বুঝিয়াছিলাম, এতরাত্রে এই দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লিতে আহার্য সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়, তথাপি চেষ্টা না করিয়াও তো নিস্তার ছিল না। অথচ তাঁর একাকী থাকিতেও ইচ্ছা নাই। সে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিয়া কহিল, চল না নতুনদা, একলা তোমার ভয় করবে — আমাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে। এখানে চোর-টোর নেই, ডিঙি কেউ নেবে না — চল।

নতুনদা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, ভয়! আমরা দর্জিপাড়ার ছেলে, যমকে ভয় করিনে, তা জানিস। কিন্তু তা বলে ছোটোলোকদের dirty পাড়ার মধ্যেও আমরা যাইনে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যামো হয়। অথচ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় — আমি তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত থাকি এবং তামাক সাজি।

কিন্তু আমি তাঁহার ব্যবহারে মনে মনে এত বিরক্ত হইয়াছিলাম যে, ইন্দ্র আভাস দিলেও, আমি কিছুতেই একাকী এই লোকটার সংসর্গে থাকিতে রাজি হইলাম না, ইন্দ্রর সঙ্গেই প্রস্থান করিলাম।

দর্জিপাড়ার বাবু হাততালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন — ঠুন-ঠুন পেয়ালা —

আমরা অনেক দূর পর্যন্ত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকিসুরে সংগীতচর্চা শুনিতে শুনিতে গেলাম। ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে অতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে কহিল, এরা কলকাতার লোক কি না, জল-হাওয়া আমাদের মতো সহ্য করতে পারে না — বুঝলি না শ্রীকান্ত!

আমি বলিলাম, হুঁ।

ইন্দ্র তখন তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় — বোধ করি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্যই দিতে চলিল। তিনি অচিরেই বি এ পাস করিয়া ডেপুটি হইবেন, কথা প্রসঙ্গে তাহাও কহিল। যাই হোক, এতদিন পরে, এখন তিনি কোথাকার ডেপুটি, কিংবা আদৌ সে-কাজ পাইয়াছেন কি না, সে সংবাদ জানি না। কিন্তু মনে হয় যেন পাইয়াছেন, না হইলে বাঙালি ডেপুটির মাঝে মাঝে এত সুখ্যাতি শুনিতে পাই কী করিয়া? তখন তাঁহার প্রথম যৌবন। শুনি, জীবনের এই সময়টায় না কি হৃদয়ের প্রশস্ততা, সমবেদনার ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি পায়, এমন আর কোনো কালে নয়, অথচ ঘণ্টা-কয়েকের সংসর্গেই যে নমুনা তিনি দেখাইয়াছিলেন, এতকালের ব্যবধানেও তাহা ভুলিতে পারা গেল না। তবে ভাগ্যে এমন সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে; না হইলে বহু পূর্বেই সংসারটা রীতিমতো একটা পুলিশ থানায় পরিণত হইয়া যাইত। কিন্তু যাক সে কথা।

কিন্তু ভগবানও যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সে খবরটা পাঠককে দেওয়া আবশ্যক। এ অঞ্চলে পথ-ঘাট, দোকান-পত্র সমস্তই ইন্দ্রর জানা ছিল। সে গিয়া মুদির দোকানে উপস্থিত হইল। কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানি শীতের ভয়ে দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এই গভীরতা যে কীরূপ অতলস্পর্শী, সেকথা যাহার জানা নাই, তাহাকে লিখিয়া বুঝানো যায় না। ইহারা অল্পরোগী নিষ্কর্মা জমিদারও নয়, বহুভারাক্রান্ত কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙালি গৃহস্থও নয়। সুতরাং ঘুমাইতে জানে। দিনের বেলা খাটিয়া খুটিয়া রাত্রিতে একবার ‘চারপাই’ আশ্রয়

করিলে, ঘরে আগুন না দিয়া, শুধুমাত্র চেঁচামেচি ও দোর-নাড়ানাড়ি করিয়া জাগাইয়া দিব এমন প্রতিজ্ঞা যদি স্বয়ং সত্যবাদী অর্জুন জয়দ্রথ-বধের পরিবর্তে করিয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকেও মিথ্যা-প্রতিজ্ঞা-পাপে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইত, তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়।

তখনই উভয়েই বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চিৎকার করিয়া এবং যতপ্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় আসিতে পারে, তাহার সবগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া, আধঘণ্টা পরে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য! জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই যে শূন্য! 'দর্জিপাড়া'-র চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। ডিঙি যেমন ছিল, তেমনি রহিয়াছে — ইনি গেলেন কোথায়? দুজনে প্রাণপণে চিৎকার করিলাম — নতুনদা, ও নতুনদা! কিন্তু কোথায় কে। ব্যাকুল আহ্বান শুধু বাম ও দক্ষিণের সু-উচ্চ পাড়ে ধাক্কা খাইয়া অস্পষ্ট হইয়া বারংবার ফিরিয়া আসিল। এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে শীতকালে বাঘের জনশ্রুতিও শোনা যাইত। গৃহস্থ কৃষকেরা দলবদ্ধ 'হুড়ার'-এর জ্বালায় সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। সহসা ইন্দ্র সেই কথাই বলিয়া বসিল, বাঘে নিলে না ত রে। ভয়ে সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল — সে কী কথা! ইতিপূর্বে তাঁহার নিরতিশয় অভদ্র ব্যবহারে আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এতবড়ো অভিশাপ তো দিই নাই।

সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল, কিছুদূরে বালুর উপর কী একটা বস্তু চাঁদের আলোয় চকচক করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি, তাঁরই সেই বহুমূল্য পাম্পশুর এক পাটি। ইন্দ্র সেই ভিজা বালির উপরেই একেবারে শুইয়া পড়িল — শ্রীকান্ত রে। আমার মাসিমাও এসেছেন যে! আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না। তখন ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয়টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা যখন মুদির দোকানে দাঁড়াইয়া তাহাকে জাগ্রত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিলাম, তখন এইদিকের কুকুরগুলাও যে সমবেত আর্ত চিৎকারে আমাদিগকে এই দুর্ঘটনার সংবাদটাই গোচর করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিল, তাহা জলের মতো চোখে পড়িল। তখনও দূরে তাহাদের ডাক শোনা যাইতেছিল। সুতরাং আর সংশয়মাত্র রহিল না যে, নেকড়েগুলা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া সেখানে ভোজন করিতেছে, তাহারই আশেপাশে দাঁড়াইয়া সেগুলা এখনও চেঁচাইয়া মরিতেছে।

অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি যাব।

আমি সভয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম — তুমি পাগল হয়েচ ভাই!

ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না, ডিঙিতে ফিরিয়া গিয়া লগিটা তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল। একটা বড়ো ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া বাঁ হাতে লইয়া কহিল, তুই থাক শ্রীকান্ত; আমি না এলে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর দিস — আমি চললুম।

তাহার মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর, কিন্তু চোখ-দুটো জ্বলিতে লাগিল। তাহাকে আমি চিনিয়াছিলাম। এ তাহার নিরর্থক শূন্য আস্ফালন নয় যে, হাত ধরিয়া দুটো ভয়ের কথা বলিলেই মিথ্যা দম্ভ মিথ্যায় মিলাইয়া যাইবে। আমি নিশ্চয়ই জানিতাম, কোনোমতেই তাহাকে নিরস্ত করা যাইবে না — সে যাইবেই। ভয়ের সহিত যে চির-অপরিচিত, তাহাকে আমিই বা কেমন করিয়া, কী বলিয়া বাধা দিব। যখন সে নিতান্তই চলিয়া যায়, তখন আর থাকিতে পারিলাম না — আমিও যা হোক একটা হাতে করিয়া অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলাম।

এইবার ইন্দ্র মুখ ফিরাইয়া আমার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল; বলিল, তুই খেপেচিস, শ্রীকান্ত? তোর দোষ কী? তুই কেন যাবি?

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া একমুহূর্তেই আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কোনোমতে গোপন করিয়া বলিলাম, তোমারই বা দোষ কী, ইন্দ্র? তুমিই বা কেন যাবে?

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার হাতের বাঁশটা টানিয়া লইয়া নৌকায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, আমারও দোষ নেই ভাই, আমিও নতুনদাকে আনতে চাইনি। কিন্তু একলা ফিরে যেতেও পারব না, আমাকে যেতেই হবে।

কিন্তু আমারও তো যাওয়া চাই। কারণ পূর্বেই একবার বলিয়াছি, আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। অতএব বাঁশটা পুনরায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া দাঁড়াইলাম, এবং আর বাদবিতণ্ডা না করিয়া উভয়েই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম।

ইন্দ্র কহিল, বালির উপর দৌড়ানো যায় না — খবরদার, সে চেষ্টা করিসনে

— জলে গিয়ে পড়বি।

সুমুখে একটা বালির ঢিপি ছিল। সেইটা অতিক্রম করিয়াই দেখা গেল অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচ-সাতটা কুকুর চিৎকার করিতেছে। যতদূর দেখা গেল, একপাল কুকুর ছাড়া বাঘ তো দূরের কথা, একটা শৃগালও নাই। সন্তর্পণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল, তাহারা কী একটা কালোপানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে। ইন্দ্র চিৎকার করিয়া ডাকিল, নতুনদা।

নতুনদা একগলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন — এই যে আমি!

দুজনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম; কুকুরগুলো সরিয়া দাঁড়াইল, এবং ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠ নিমজ্জিত মূর্ছিতপ্রায় তাহার দর্জিপাড়ার মাসতুতো ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনও তাঁহার একটা পায়ে বহুমূল্য পাম্প, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি, — ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গেলে সেই যে তিনি হাততালি দিয়া 'ঠুন-ঠুন-পেয়ালা' ধরিয়াছিলেন, খুব সম্ভব, সেই সংগীতচর্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলো দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এবং এই অশ্রুতপূর্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব পোশাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা আসিয়াও আত্মরক্ষার কোনো উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন; এবং এই দুর্দান্ত শীতের রাত্রে তুষার-শীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া এই অর্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ঘোর কাটাইয়া তাঁহাকে চাঙা করিয়া তুলিতেও, সে রাত্রে আমাদিগকে কম মেহনত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, বাবু ডাঙায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন, আমার একপাটি পাম্প?

সেটা ওখানে পড়িয়া আছে — সংবাদ দিতেই, তিনি সমস্ত দুঃখ ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া, তাহা অবিলম্বে হস্তগত করিবার জন্য সোজা খাড়া হইয়া উঠিলেন। তার পরে কোটের জন্য, গলাবন্ধের জন্য, মোজার জন্য, দস্তানার জন্য একে একে পুনঃপুন শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং সে রাত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরিয়া

গিয়া নিজেদের ঘাটে পৌঁছিতে পারিলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল এই বলিয়া আমাদের তিরস্কার করিতে লাগিলেন — কেন আমরা নির্বোধের মতো সে সব তাঁহার গা হইতে তাড়াতাড়ি খুলিতে গিয়াছিলাম। না খুলিলে তো ধুলাবালি লাগিয়া এমন করিয়া মাটি হইতে পারিত না। আমরা খোট্টার দেশের লোক, আমরা চাষার শামিল, আমরা এসব কখনও চোখ্‌খে দেখি নাই — এই সমস্ত অবিশ্রান্ত বকিতে বকিতে গেলেন। যে দেহটাতে ইতিপূর্বে একটি ফোঁটা জল লাগাইতেও তিনি ভয়ে সারা হইতেছিলেন, জামা-কাপড়ের শোকে সে দেহটাকেও তিনি বিস্মৃত হইলেন। উপলক্ষ্য যে আসল বস্তুকেও কেমন করিয়া বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা এই সব লোকের সংসর্গে না আসিলে, এমন করিয়া চোখে পড়ে না।

রাত্রি দুটার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। আমার যে র‍্যাপারখানির বিকট গন্ধে কলিকাতার বাবু ইতিপূর্বে মূর্ছিত হইতেছিলেন সেইখানি গায়ে দিয়া, তাহারই অবিশ্রাম নিন্দা করিতে করিতে — পা মুছিতেও ঘৃণা হয়, তাহা পুনঃপুন শুনাইতে শুনাইতে ইন্দ্রর খানি পরিধান করিয়া তিনি সে যাত্রা আত্মরক্ষা করিয়া বাটী গেলেন। যাই হোক, তিনি যে দয়া করিয়া ব্যাঘ্রকবলিত না হইয়া সশরীরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার এই অনুগ্রহের আনন্দেই আমরা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। এত উপদ্রব-অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়া আজ নৌকা চড়ার পরিসমাপ্তি করিয়া, এই দুর্জয় শীতের রাত্রে কোঁচার খুঁটমাত্র অবলম্বন করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী ফিরিয়া গেলাম।

সিংহের দেশ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৯৪-১৯৫০)

মোম্বাসা থেকে রেলপথ গিয়েচে কিসুমু-ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হ্রদের ধারে — তারই একটা শাখা লাইন তখন তৈরি হচ্ছিল। জায়গাটা মোম্বাসা থেকে সাড়ে তিনশো মাইল পশ্চিমে। ইউগান্ডা রেলওয়ের নুডসবার্গ স্টেশন থেকে বাহাত্তর মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। এখানে শংকর কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পের কেরানি ও সরকারি স্টোরকিপার হয়ে এসেচে। থাকে ছোটো একটা তাঁবুতে। তার আশে-পাশে অনেক তাঁবু। এখানে এখনও বাড়িঘর তৈরি হয়নি বলে তাঁবুতেই সবাই থাকে। তাঁবুগুলো একটা খোলা জায়গায় চক্রাকারে সাজানো — তাদের চারিধারে ঘিরে বহু দূরব্যাপী মুক্ত প্রান্তর, লম্বা লম্বা ঘাসে ভরা, মাঝে মাঝে গাছ। তাঁবুগুলোর ঠিক গায়েই খোলা জায়গার শেষ সীমায় একটা বড়ো বাওবাব গাছ। আফ্রিকার বিখ্যাত গাছ, শংকর কতবার ছবিতে দেখেচে, এবার সত্যিকার বাওবাব দেখে শংকরের যেন আশ মেটে না।

নতুন দেশ, শংকরের তরুণ তাজা মন — সে ইউগান্ডার এই নির্জন মাঠ ও বনে নিজের স্বপ্নের সার্থকতাকে যেন খুঁজে পেলে। কাজ শেষ হয়ে যেতেই সে তাঁবু থেকে রোজ বেরিয়ে পড়ত — যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকে বেড়াতে বার হত — পুবে, পশ্চিমে, দক্ষিণে, উত্তরে। সব দিকেই লম্বা লম্বা ঘাস, কোথাও মানুষের মাথা সমান উঁচু, কোথাও তার চেয়েও উঁচু।

কনস্ট্রাকশন তাঁবুর ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একদিন শংকরকে ডেকে বললেন — শোনো রায়, ওরকম এখানে বেড়িও না। বিনা বন্দুকে এখানে এক পা-ও যেও না। প্রথম, এই ঘাসের জমিতে পথ হারাতে পারো। পথ হারিয়ে লোকে এসব

জায়গায় মারাও গিয়েচে জলের অভাবে। দ্বিতীয়, ইউগান্ডা সিংহের দেশ। এখানে আমাদের সাড়াশব্দ আর হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজে সিংহ হয়তো একটু দূরে চলে গিয়েচে — কিন্তু ওদের বিশ্বাস নেই। খুব সাবধান। এসব অঞ্চল মোটেই নিরাপদ নয়।

একদিন দুপুরের পরে কাজকর্ম বেশ পুরোদমে চলচে, হঠাৎ তাঁবু থেকে কিছু দূরে লম্বা ঘাসের জমির মধ্যে মনুষ্যকণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল। সবাই সেদিকে ছুটে গেল ব্যাপার কী দেখতে। শংকরও ছুটল — ঘাসের জমি পাতি-পাতি করে খোঁজা হল — কিছুই নেই সেখানে।

কীসের চিৎকার তবে?

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এলেন। কুলিদের নাম-ডাকা হল, দেখা গেল একজন কুলি অনুপস্থিত। অনুসন্ধানে জানা গেল সে একটু আগে ঘাসের বনের দিকে কী কাজে গিয়েছিল, তাকে ফিরে আসতে কেউ দেখেনি।

খোঁজাখুঁজি করতে করতে ঘাসের বনের বাইরে বালির ওপরে ক-টা সিংহের পায়ের দাগ পাওয়া গেল। সাহেব বন্দুক নিয়ে লোকজন সঙ্গে পায়ের দাগ দেখে দেখে অনেক দূর গিয়ে একটা বড়ো পাথরের আড়ালে হতভাগ্য কুলির রক্তাক্ত দেহ বার করলেন।

তাকে তাঁবুতে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হল। কিন্তু সিংহের কোনো চিহ্ন মিলল না। লোকজনের চিৎকারে সে শিকার ফেলে পালিয়েচে। সন্ধ্যার পূর্বেই কুলিটা মারা গেল।

তাঁবুর চারিপাশের লম্বা ঘাস অনেক দূর পর্যন্ত কেটে সাফ করে দেওয়া গেল পরদিনই। দিনকতক সিংহের কথা ছাড়া তাঁবুতে আর কোনো গল্প নেই। তারপর মাসখানেক পরে ঘটনাটা পুরোনো হয়ে গেল, সে কথা সকলের মনে চাপা পড়ে গেল। কাজকর্ম আবার বেশ চলল।

সেদিন দিনে খুব গরম। সন্ধ্যার একটু পরেই কিন্তু ঠান্ডা পড়ল। কুলিদের তাঁবুর সামনে অনেক কাঠকুটো জ্বালিয়ে আগুন করা হয়েচে। সেখানে তাঁবুর সবাই গোল হয়ে গল্পগুজব করচে। শংকরও সেখানে আছে, সে ওদের গল্প শুনচে এবং অগ্নিকুণ্ডের

আলোতে 'কেনিয়া মর্নিং নিউজ' পড়চে। খবরের কাগজখানা পাঁচদিনের পুরোনো। কিন্তু এ জনহীন প্রান্তরে তবু এখানাতে বাইরের দুনিয়ার যা কিছু একটা খবর পাওয়া যায়।

তিরুমল আপ্পা বলে একজন মাদ্রাজি কেরানির সঙ্গো শংকরের খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিরুমল তরুণ যুবক, বেশ ইংরিজি জানে, মনেও খুব উৎসাহ। সে বাড়ি থেকে পলিয়ে এসেচে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। শংকরের পাশে বসে সে আজ সন্ধ্যা থেকে ক্রমাগত দেশের কথা, তার বাপ-মায়ের কথা, তার ছোটো বোনের কথা বলচে! ছোটো বোনকে সে বড়ো ভালোবাসে। বাড়ি ছেড়ে এসে তার কথাই তিরুমলের বড়ো মনে হয়। একবার সে দেশের দিকে যাবে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে। মাস-দুই ছুটি মঞ্জুর করবে না সাহেব?

ক্রমে রাত বেশি হল। মাঝে-মাঝে আগুন নিভে যাচ্ছে, আবার কুলিরা তাতে কাঠকুটো ফেলে দিচ্চে। আরও অনেকে উঠে শুতে গেল। কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ ধীরে ধীরে দূর দিগন্তে দেখা দিল — সমগ্র প্রান্তর জুড়ে আলো-আঁধারে লুকোচুরি আর বুনো গাছের দীর্ঘ-দীর্ঘ ছায়া।

শংকরের ভারী অদ্ভুত মনে হচ্ছিল বহুদূর বিদেশের এই স্তব্ধ রাত্রির সৌন্দর্য। কুলিদের ঘরের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে একদৃষ্টে সে সম্মুখের বিশাল জনহীন তৃণভূমির আলো আঁধার-মাখা রূপের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কী ভাবছিল। ওই বাওবাব গাছটার ওদিকে অজানা দেশের সীমা কেপটাউন পর্যন্ত বিস্তৃত — মধ্যে পড়বে কত পর্বত, অরণ্য, প্রাগৈতিহাসিক যুগের নগর জিম্বারি — বিশাল ও বিভীষিকাময় কালাহারি মরুভূমি, হীরকের দেশ, সোনার খনির দেশ।

একজন বড়ো স্বর্ণান্বেষী পর্যটক যেতে যেতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। যে পাথরটাতে লেগে হোঁচট খেলেন সেটা হাতে তুলে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার সঙ্গো সোনা মেশানো রয়েছে। সে জায়গায় বড়ো একটা সোনার খনি বেরিয়ে পড়ল। এ ধরনের কত গল্প সে পড়েচে দেশে থাকতে।

এই সেই আফ্রিকা, সেই রহস্যময় মহাদেশ, সোনার দেশ, হিরের দেশ — কত অজানা জাতি, অজানা দৃশ্যাবলি, অজানা জীবজন্তু এর সীমাহীন ট্রপিক্যাল অরণ্যে আত্মগোপন করে আছে, কে তার হিসেব রেখেচে?

কত কী ভাবতে-ভাবতে শংকর কখন ঘুমিয়ে পড়েচে। হঠাৎ কীসের শব্দে তার ঘুম ভাঙল। সে ধড়মড় করে জেগে উঠে বসল। চাঁদ আকাশে অনেকটা উঠেচে। ধবধবে সাদা জ্যোৎস্না দিনের মতো পরিষ্কার। অগ্নিকুণ্ডের আগুন গিয়েচে নিবে। কুলিরা সব কুণ্ডলী পাকিয়ে আগুনের ওপরে শুয়ে আছে! কোনোদিকে কোনো শব্দ নেই।

হঠাৎ শংকরের দৃষ্টি পড়ল তার পাশে — এখানে তো তিরুমল আপ্পা বসে তার সঙ্গে গল্প করিছল। সে কোথায়? তাহলে হয়তো সে তাঁবুর মধ্যে ঘুমুতে গিয়ে থাকবে।

শংকরও নিজে উঠে শুতে যাবার উদ্যোগ করচে, এমন সময়ে অল্প দূরেই পশ্চিম কোণে মাঠের মধ্যে ভীষণ সিংহগর্জন শুনতে পাওয়া গেল। রাত্রির অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোক যেন কেঁপে উঠল সে রবে। কুলিরা ধড়মড় করে জেগে উঠল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক নিয়ে তাঁবুর বাইরে এলেন। শংকর জীবনে এই প্রথম শুনলে সিংহের গর্জন — সেই দিক-দিশাহীন তৃণভূমির মধ্যে শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় সে গর্জন যে কী এক অনির্দেশ্য অনুভূতি তার মনে জাগালে! তা ভয় নয়, সে এক রহস্যময় ও জটিল মনোভাব। একজন বৃদ্ধ মাসাই কুলি ছিল তাঁবুতে। সে বললে, সিংহ লোক মেরেচে। লোক না মারলে এমন গর্জন করবে না।

তাঁবুর ভেতর থেকে তিরুমলের সঙ্গী এসে হঠাৎ জানালে তিরুমলের বিছানা শূন্য। সে তাঁবুর মধ্যে কোথাও নেই।

কথাটা শুনে সবাই চমকে উঠল। শংকর নিজে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে দেখে এল সত্যিই সেখানে কেউ নেই। তখনি কুলিরা আলো জ্বেলে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সব তাঁবুগুলোতে খোঁজ করা হল, নাম ধরে চিৎকার করে ডাকাডাকি করলে সবাই মিলে — তিরুমলের কোনো সাড়া মিলল না।

তিরুমল যেখানটাতে শুয়েছিল, সেখানটাতে ভালো করে দেখা গেল তখন। একটা কোনো ভারী জিনিসকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ মাটির ওপর সুস্পষ্ট। ব্যাপারটা বুঝতে কারও দেরি হল না। বাওবাব গাছের কাছে তিরুমলের জামার হাতার খানিকটা টুকরো পাওয়া গেল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক নিয়ে আগে আগে চললেন, শংকর তাঁর সঙ্গে চলল। কুলিরা তাঁদের অনুসরণ করতে লাগল।

সেই গভীর রাত্রে তাঁবু থেকে দূরে মাঠে চারিদিকে অনেক জায়গা খোঁজা হল, তিরুমলের দেহের কোনো সন্ধান মিলল না। এবার আবার সিংহগর্জন শোনা গেল — কিন্তু দূরে। যেন এই নির্জন প্রান্তরের অধিষ্ঠাত্রী কোনো রহস্যময়ী রাক্ষসীর বিকট চিৎকার।

মাসাই কুলিটা বললে — সিংহ দেহ নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ওকে নিয়ে আমাদের ভুগতে হবে। আরও অনেকগুলো মানুষ ও ঘায়েল না করে ছাড়বে না। সবাই সাবধান। যে সিংহ একবার মানুষ খেতে শুরু করে, সে অত্যন্ত ধূর্ত হয়ে ওঠে।

রাত যখন প্রায় তিনটে, তখন সবাই ফিরল তাঁবুতে। বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সারা মাঠ আলো হয়ে উঠেচে। আফ্রিকার এই অংশে পাখি বড়ো একটা দেখা যায় না দিনমানে, কিন্তু এক ধরনের রাত্রিচর পাখির ডাক শুনতে পাওয়া যায় রাত্রে — সে সুর অপার্থিব ধরনের মিষ্টি। এইমাত্র সেই পাখি কোন্ গাছের মাথায় বহুদূরে ডেকে উঠল। মনটা এক মুহূর্তে উদাস করে দেয়। শংকর ঘুমুতে গেল না। আর সবাই তাঁবুর মধ্যে শুতে গেল — কারণ পরিশ্রম কারও কম হয়নি। তাঁবুর সামনে কাঠকুটো জ্বালিয়ে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করা গেল। শংকর সাহস করে বাইরে বসতে অবিশ্যি পারলে না — এরকম দুঃসাহসের কোনো অর্থ হয় না। তবে সে দিনের খড়ের ঘরে শুয়ে জানলা দিয়ে বিস্তৃত জ্যোৎস্নালোকিত অজানা প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইল।

মনে কী এক অদ্ভুত ভাব। তিরুমলের অদৃষ্টলিপি এই জন্যেই বোধ হয় তাকে আফ্রিকায় টেনে এনেছিল। তাকেই বা কী জন্যে এখানে এনেচে তার অদৃষ্ট, কে জানে তার খবর?

আফ্রিকা অদ্ভুত সুন্দর দেখতে — কিন্তু আফ্রিকা ভয়ংকর! দেখতে বাবলা বনে ভরতি বাংলাদেশের মাঠের মতো দেখালে কী হবে, আফ্রিকা অজানা মৃত্যুসংকুল! যেখানে সেখানে অতর্কিত নিষ্ঠুর মৃত্যুর ফাঁদ পাতা... পর মুহূর্তে কী ঘটবে, এ মুহূর্তে তা কেউ বলতে পারে না।

আফ্রিকা প্রথম বলি গ্রহণ করেচে — তরুণ হিন্দু যুবক তিরুমলকে। সে বলি চায়।

তিরুমল তো গেল, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পে পরদিন থেকে এমন অবস্থা হয়ে উঠল যে আর সেখানে সিংহের উপদ্রবে থাকা যায় না। মানুষ-খেকো সিংহ অতি ভয়ানক জানোয়ার! যেমন সে ধূর্ত তেমনি সাহসী। সন্ধ্যা তো দূরের কথা, দিনমানেই একা বেশিদূর যাওয়া যায় না। সন্ধ্যার আগে তাঁবুর মাঠে নানা জায়গায় বড়ো বড়ো আগুনের কুণ্ড করা হয়, কুলিরা আগুনের কাছ ঘেঁষে বসে গল্প করে, রান্না করে, সেখানে বসেই খাওয়া-দাওয়া করে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক হাতে রাত্রে তিন-চার বার তাঁবুর চারিদিকে ঘুরে পাহারা দেন, ফাঁকা আওয়াজ করেন — এত সতর্কতার মধ্যেও একটা কুলিকে সিংহ নিয়ে পালাল তিরুমলকে মারবার ঠিক দুদিন পরে সন্ধ্যা রাত্রে। তার পরদিন একটা সোমালি কুলি দুপুরে তাঁবু থেকে তিনশো গজের মধ্যে পাথরের ঢিবিতে পাথর ভাঙতে গেল — সন্ধ্যায় সে আর ফিরে এল না।

সেই রাত্রেই, রাত দশটার পরে, শংকর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের তাঁবু থেকে ফিরচে, লোকজন কেউ বড়ো একটা বাইরে নেই, সকাল সকাল যে যার ঘরে শুয়ে পড়েচে, কেবল এখানে ওখানে দু-একটা নির্বাপিত-প্রায় অগ্নিকুণ্ড। দূরে শেয়াল ডাকচে — শেয়ালের ডাক শুনলেই শংকরের মনে হয় সে বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে আছে — চোখ বুজে সে নিজের গ্রামটা ভাববার চেষ্টা করে, তাদের ঘরের কোণের সেই বিলিতি-আমড়া গাছটা ভাববার চেষ্টা করে — আজও সে একবার থমকে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি চোখ বুজলে।

কী চমৎকার লাগে! কোথায় সে? সেই তাদের গাঁয়ের বাড়িতে জানলার কাছে তক্তপোশে শুয়ে? বিলিতি আমড়া গাছটার ডালপালা চোখ খুললেই চোখে পড়বে? ঠিক? দেখবে সে চোখ খুলে?

শংকর ধীরে ধীরে চোখ খুললে।

অন্ধকার প্রান্তর। দূরে সেই বড়ো বাওবাব গাছটা অস্পষ্ট অন্ধকারে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ তার মনে হল সামনের একটা ছাতার মতো গোল খড়ের নীচু চালের ওপর একটা কী যেন নড়চে। পরক্ষণেই সে ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল।

প্রকাণ্ড একটা সিংহ খড়ের চাল থাবা দিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত করবার চেষ্টা করচে ও মাঝে মাঝে নাকটা চালের গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে কীসের যেন ঘ্রাণ নিচ্চে!

তার কাছ থেকে চালাটার দূরত্ব বড়ো জোর বিশ হাত।

শংকর বুঝলে সে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। সিংহ চালার খড় খুঁচিয়ে গর্ত করতে ব্যস্ত, সেখান দিয়ে ঢুকে সে মানুষ নেবে — শংকরকে সে এখনও দেখতে পায়নি। তাঁবুর বাইরে কোথাও লোক নেই, সিংহের ভয়ে বেশি রাত্রে কেউ বাইরে থাকে না। নিজে সে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, একগাছা লাঠি পর্যন্ত নেই হাতে।

শংকর নিঃশব্দে পিছু হঠতে লাগল ইঞ্জিনিয়ারের তাঁবুর দিকে, সিংহের দিকে চোখ রেখে। এক-মিনিট ... দু-মিনিট ... নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর যে তার এত কর্তৃত্ব ছিল, তা এর আগে শংকর জানত না। একটা ভীতিসূচক শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরুল না বা সে হঠাৎ পিছু ফিরে দৌড় দেবার চেষ্টাও করলে না।

ইঞ্জিনিয়ারের তাঁবুর পর্দা উঠিয়ে সে ঢুকে দেখলে সাহেব টেবিলে বসে তখনও কাজ করচে। সাহেব ওর রকম-সকম দেখে বিস্মিত হয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ও বললে — সাহেব, সিংহ! ...

সাহেব লাফিয়ে উঠল — কই? কোথায়?

বন্দুকের র‍্যাকে একটা ৩৭৫ ম্যানলিকার রাইফেল ছিল — সাহেব সেটা নামিয়ে নিলে। শংকরকে আর একটা রাইফেল দিলে। দুজনে তাঁবুর পর্দা তুলে আস্তে আস্তে বাইরে এল। একটু দূরেই কুলি লাইনের সেই গোল চালা। কিন্তু চালার ওপর কোথায় সিংহ? শংকর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে— এই মাত্র দেখে গেলাম স্যার। ওই চালার ওপর সিংহ থাবা দিয়ে খড় খোঁচাচ্চে।

সাহেব বললে — পালিয়েচে। জাগাও সবাইকে।

একটু পরে তাঁবুতে মহা শোরগোল পড়ে গেল। লাঠি, সড়কি, গাঁতি, মুগুর নিয়ে কুলির দল হল্লা করে বেরিয়ে পড়ল — খোঁজ খোঁজ চারদিকে, খড়ের চালে সত্যিই ফুটো দেখা গেল। সিংহের পায়ের দাগও পাওয়া গেল। কিন্তু সিংহ উধাও হয়েচে। আগুনের কুণ্ডে বেশি করে কাঠ ও শুকনো খড় ফেলে আগুন আবার জ্বালানো হল। সে রাত্রে অনেকেরই ভালো ঘুম হল না, কিন্তু তাঁবুতে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল — একটা মহা শোরগোলের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। মাসাই কুলিরা 'সিম্বা সিম্বা' বলে চিৎকার করচে। দু-বার বন্দুকের আওয়াজ হল। শংকর তাঁবুর বাইরে

এসে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করে জানলে সিংহ এসে আস্তাবলের একটা ভারবাহী অশ্বতরকে জখম করে গিয়েচে — এই মাত্র ! সবাই শেষ রাত্রে একটু ঝিমিয়ে পড়েচে আর সেই সময়ে এই কাণ্ড।

পরদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে একটা ছোকরা কুলিকে তাঁবু থেকে একশো হাতের মধ্যে সিংহে নিয়ে গেল। দিন চারেক পরে আর একটা কুলিকে নিলে বাওবাব গাছটার তলা থেকে।

কুলিরা আর কেউ কাজ করতে চায় না। লম্বা লাইনে গাঁতিওয়ালা কুলিদের অনেক সময়ে খুব ছোটো দলে ভাগ করে কাজ করতে হয় — তারা তাঁবু ছেড়ে দিনের বেলাতেও বেশিদূর যেতে চায় না। তাঁবুর মধ্যে থাকাও রাত্রে নিরাপদ নয়। সকলেরই মনে ভয় — প্রত্যেকেই ভাবে এবার তার পালা। কাকে কখন নেবে কিছু স্থিরতা নেই। এই অবস্থায় কাজ হয় না। কেবল মাসাই কুলিরা অবিচলিত রইল — তারা যমকেও ভয় করে না। তাঁবু থেকে দু-মাইল দূরে গাঁতির কাজ তারাই করে, সাহেব বন্দুক নিয়ে দিনের মধ্যে চার-পাঁচবার তাদের দেখাশোনা করে আসে।

কত নতুন ব্যবস্থা করা হল, কিছুতেই সিংহের উপদ্রব কমল না। কত চেষ্টা করেও সিংহ শিকার করা গেল না। অনেকে বললে সিংহ একটা নয়, অনেকগুলো — ক-টা মেরে ফেলে যাবে ?

সাহেব বললে — মানুষ-খেকো সিংহ বেশি থাকে না। এ একটা সিংহেরই কাজ।

একদিন সাহেব শংকরকে ডেকে বললে বন্দুকটা নিয়ে গাঁতিদার কুলিদের একবার দেখে আসতে। শংকর বললে — সাহেব, তোমার ম্যানলিকারটা দাও।

সাহেব রাজি হল। শংকর বন্দুক নিয়ে একটা অশ্বতরে চড়ে রওনা হল — তাঁবু থেকে মাইল খানেক দূরে এক জায়গায় একটা ছোটো জলা। শংকর দূর থেকে জলাটা যখন দেখতে পেয়েচে, তখন বেলা প্রায় তিনটে। কেউ কোনো দিকে নেই, রোদের ঝাঁজ মাঠের মধ্যে তাপ-তরঙ্গের সৃষ্টি করেচে।

হঠাৎ অশ্বতর থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আর কিছুতেই সেটা এগিয়ে যেতে চায় না। শংকরের মনে হল জায়গাটার দিকে যেতে অশ্বতরটা ভয় পাচ্ছে। একটু পরে পাশের ঝোপে কী যেন একটা নড়ল। কিন্তু সেদিকে চেয়ে সে কিছু দেখতে পেল না। সে

অশ্বতর থেকে নামল। তবুও অশ্বতর নড়তে চায় না।

হঠাৎ শংকরের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঝোপের মধ্যে সিংহ তার জন্যে ওঁত পেতে বসে নেই তো? অনেক সময়ে এরকম হয় সে জানে, সিংহ পথের পাশে ঝোপঝাপের মধ্যে লুকিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত নিঃশব্দে তার শিকারের অনুসরণ করে। নির্জন স্থানে সুবিধা বুঝে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে। যদি তাই হয়? শংকর অশ্বতর নিয়ে আর এগিয়ে যাওয়া উচিত বিবেচনা করলে না। ভাবলে তাঁবুতে ফিরেই যাই। সবে সে তাঁবুর দিকে অশ্বতরের মুখটা ফিরিয়েছে, এমন সময় আবার ঝোপের মধ্যে কী একটা নড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক সিংহগর্জন এবং একটা ধূসর বর্ণের বিরাট দেহ সশব্দে অশ্বতরের ওপর এসে পড়ল। শংকর তখন হাত চারেক এগিয়ে আছে। সে তখনি ফিরে দাঁড়িয়ে বন্দুক উঁচিয়ে উপরি উপরি দু-বার গুলি করলে। গুলি লেগেচে কি না বোঝা গেল না, কিন্তু তখন অশ্বতর মাটিতে লুটিয়ে পড়েচে — ধূসর বর্ণের জানোয়ারটা পলাতক। শংকর পরীক্ষা করে দেখলে অশ্বতরের কাঁধের কাছে অনেকটা মাংস ছিন্নভিন্ন, রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় সেটা ছটফট করচে। শংকর এক গুলিতে তার যন্ত্রণার অবসান করলে। তারপর সে তাঁবুতে ফিরে এল।

সাহেব বললে, সিংহ নিশ্চয়ই জখম হয়েচে। বন্দুকের গুলি যদি গায়ে লাগে তবে দস্তুরমতো জখম তাকে হতেই হবে। কিন্তু গুলি লেগেছিল তো? শংকর বললে — গুলি লাগালাগির কথা সে বলতে পারে না। বন্দুক ছুঁড়েছিল, এই মাত্র কথা। লোকজন নিয়ে খোঁজাখুঁজি করে দু-তিন দিনেও কোনো আহত বা মৃত সিংহের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না।

জুন মাসের প্রথম থেকে বর্ষা নামল। কতটা সিংহের উপদ্রবের জন্যে, কতকটা বা জলাভূমির সান্নিধ্যের জন্যে অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় তাঁবু ওখান থেকে উঠে গেল।

শংকরকে আর কনস্ট্রাকশন তাঁবুতে থাকতে হল না। কিসুমু থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে একটা ছোটো স্টেশনে সে স্টেশন মাস্টারের কাজ পেয়ে জিনিসপত্র নিয়ে সেখানেই চলে গেল।

বই কেনা

সৈয়দ মুজতবা আলী

(১৯০৪-১৯৭৪)

মাছি-মারা-কেরানি নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যে-দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময় উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, দুটো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে না কি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে বিস্তর চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবী দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন 'হায় আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকত, তাহলে আচক্রবাল বিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণির সম্পূর্ণ সৌন্দর্য এক সঙ্গেই দেখতে পেতুম।

কথাটা যে খাঁটি, সে-কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায়। এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপশোশ ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাত। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞানবিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক একটা করে মনের চোখ ফুটতে থাকে।'

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য উপন্যাসের একচোখো দৈত্যের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুলতেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটা কী? প্রথমত — বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোয় আরও একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রান্ড রাসেল বলেছেন, 'সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতরে ডুব দেওয়া। যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, ভবযন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা ততই বেশি হয়।'

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতহাস হার মানলে ভূগোল — আরও কত কী।

কিন্তু প্রশ্ন এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কী প্রকারে?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিছু দেশ ভ্রমণ করার মতো সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবেই হয়তো ওমর খৈয়াম বলেছিলেন, —

Here with a loaf of bread
  benenth the bough,
A flask of wine, a book of
  verse and thou,
Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow.

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত যৌবনা — যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশ্তের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেননি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী হজরত মোহম্মদ সাহেব শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে 'আল্লামা বিল কলমি' অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন, 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই — বই per excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক — *The book.*

যে-দেবকে সকল মঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনিই তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে, তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালি নাগর ধর্মের কাহিনি শোনে না। তার ঐ কথা 'অত কাঁচা পয়হা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব?'

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য — কনিষ্ঠা পরিমাণ — লুকনো রয়েছে। সেটুকু এই যে, বই কিনতে পয়সা লাগে — ব্যাস। এর বেশি আর কিছু নয়।

বইয়ের দাম আরও কমানো যায়, তবে আরও অনেক বেশি বই বিক্রি হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও', তবে সে বলে বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাব কী করে?'

'কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাংলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসি ভাষা। এ-ভাষায় বাংলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চোদ্দো আনা, জোর পাঁচ সিকে দিয়ে যে-কোনো ভালো ফরাসি বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন?'

'আজ্ঞে, ফরাসি প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোনো ভালো বই এক ঝটকায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে! আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দুহাজার ছাপাতে গেলেই। বেশি ছাপিয়ে দেউলে হব না কি?

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে, বই সস্তা করা যায় না।

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ওই দিয়ে সে পেটের ভাত জোগাড় করে। সে ঐ ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ — দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনও দেউলে হয়নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখানে থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মতো অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মতো একগাদা নতুন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে, এবং সর্বশেষ সে কেনে খ্যাপার মতো, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে এই একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা যার দরুন সকালবেলা চোখের সামনে সারে সার গোলাপি হাতি দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কী করি? আমি একধারে producer এবং consumer তামাকের মিকশ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে producer সৈয়দ মুজতবা আলী এবং সেইটে খেয়ে নিজেই consumer ঃ আরও বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি একখানা বই produce করেছি। — কেউ কেনে না বলে আমিই consumer, অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

* * * *

মার্কটুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মতো ছিল। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমনকি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত — পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্কটুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেলফ জোগাড় করছ না কেন?'

মার্কটুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে ঘাড়ে চুলকে বললেন, 'ভাই, বলেছ ঠিকই — কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় জোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

শুধু মার্কটুনেয়েই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে, আর কিছু বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরত না দিয়ে। যে-মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না, সেই লোকই দেখা যায় বইয়ের

বেলায় সর্বপ্রকার বিবেক বিবর্জিত। তার কারণটা কী?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, 'ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর? আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষু-গোচর করতে চাই। ধনীর মেহন্নতের ফল হল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে, ঢের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না — বই পড়তে পারে না।'

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ, ই, ডি দিয়ে, 'অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জনের চেয়ে মহত্তর।'

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক জোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-বিহারণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায় সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে কিন্তু গরবিনি ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপুত হয় না। সব কিছুই তার স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে, 'তবে একখানা ভালো বই দিলে হয় না?' গরবিনি নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।'

যেমন স্ত্রী যেমন স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলে তারা ওই জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালোবাসা দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জত

করতে চায়, তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়তো মনে মনে পঞ্চাশ গুণে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদ্রে জিদের মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন — অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্তালিনীয়রা তখন লাগল জিদের পিছনে — গালিগালাজ কটুবাক্য করে জিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলল। কিন্তু আশ্চর্য, জিদের লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ করে সব কিছু শুনে গেলেন, জিদের হয়ে লড়লেন না। জিদের জিগরে জোর চোট লাগল — তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল, জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মূর্ছা গেল, কিন্তু সম্বিত ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটল নিলাম-খানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

যে-সব লেখক জিদের হয়ে লড়েননি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষরসহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জাল বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের মধ্যিখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলুম — কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন — জাহাজের টাইপ করা একশো লাইন দৈনিক কাগজে সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন — যত কম লোকে কেনাকাটার খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গল। (বাংলা দেশে না কি একবার এরকম টিকি বিক্রি হয়েছিল!)

শুনতে পাই, এঁরা না কি জিদকে কখনও ক্ষমা করেননি।

* * * *

আর কত বলব? বাঙালির কি চেতনা হবে?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকত। আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালি যদি হটেনটট হত, তবে কোন দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতে কোথাও দেখিনি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, 'বাঙালির পয়সার অভাব।' বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ' থেকে?

থাক থাক। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থু থু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উলটোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালির বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

দেবতামুড়া ও ডম্বুর

সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা

(১৮৬০-১৯৩৫)

ত্রিপুরা রাজ্যে উত্তর হইতে দক্ষিণদিক ব্যাপিয়া যে সমুদয় সুদীর্ঘ পর্বতমালা সমসূত্রে অবস্থিত, তন্মধ্যের পশ্চিমদিকস্থ ন্যূনকল্পে ৭৫ মাইল দীর্ঘ গিরিশ্রেণি 'বড়মুড়া' নামে প্রসিদ্ধ। ওম্পিছড়া নামক যে একটি ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে আগত হইয়া ত্রিপুরার দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত গোমতী নদীর সহিত বড়মুড়া পর্বতমালার পূর্বদিকে সম্মিলিত হইয়াছে, তাহার নিকটবর্তী উক্ত পর্বতের ক্রমনিম্ন গাত্রে শ্রেণিবদ্ধভাবে খোদিত কতিপয় দেবমূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ব্যতিরেকে তৎসমুদয় মূর্তির ঊর্ধ্বভাগে গভীর অরণ্যে প্রচ্ছাদিত পর্বত-গাত্রে একটি মহিষমর্দিনী দুর্গার প্রতিমূর্তি খোদিত আছে।

কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা উক্ত মূর্তিনিচয় এবংবিধ জনমানবহীন অরণ্যসংকুল প্রদেশে খোদিত হইয়াছিল, ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় না; এবং এই কৌতূহল উদ্দীপক বিষয় কখনও জনসমাজে উদ্‌ঘাটিত হইবে কি না ইহাও বলা দুষ্কর।

সম্ভবত কোনো ঘটনা বিশেষের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কিংবা বৌদ্ধধর্মের অবনতি-কালে হিন্দুধর্মের বহুল প্রচার উদ্দেশ্যে, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লোক-পূর্ণ প্রদেশের সমীপবর্তী এই স্থানে উল্লিখিত হিন্দুদেবমূর্তিনিচয় বর্তমান ত্রিপুরেশগণের পূর্বপুরুষ কোনো মহীপাল-কর্তৃক খোদিত হইয়া থাকিবে।

সুপ্রাচীন কালে চন্দ্রবংশসম্ভূত হিন্দু নৃপাল 'যুঝারফা' এতৎ প্রদেশের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মগ অধিপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহারই স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তৎকর্তৃক বর্ণিত মূর্তিনিচয় এই স্থানে খোদিত হইয়া অক্ষয় কীর্তি যে স্থাপিত না হইয়াছিল ইহাই বা কে বলিতে পারে? অদ্যাপি এই স্থানের সন্নিধানে অবস্থিত 'অমরপুর' প্রভৃতি প্রাচীন জনপদে বহু সংখ্যক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী 'মগ' ও 'চাকমা' নামক পার্বত্য লোক বাস করিতেছে।

প্রাগুক্ত 'বড়মুড়া' নামে খ্যাত পর্বতমালার যে অংশে মূর্তিনিচয় খোদিত আছে, তাহা 'উদয়পুর' ও 'অমরপুর' নামক ত্রিপুররাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ দুইটি প্রাচীন রাজধানীর মধ্যবর্তী সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। এতদঞ্চলস্থ সর্ব সাধারণ কর্তৃক পর্বতের এই স্থান 'দেবতামুড়া' নামে অভিহিত হয়।

অধুনা ত্রিপুরা দেশের কোনো স্থানেই ভাস্কর-শিল্পী বর্তমান নাই, তজ্জন্য এইরূপ সম্ভাবিত হইতে পারে এতৎপ্রদেশস্থ প্রস্তরমূর্তিনিচয় 'গয়া' প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং তদ্রূপ হওয়াও বিচিত্র নহে। কিন্তু একদা এতদঞ্চলেও যে ভাস্করশিল্পী ছিল, তাহা পর্বতগাত্রস্থ মূর্তিনিচয় পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রতীয়মান হয়। তবে তাহারা এই দেশনিবাসী কি না ইহা বলা দুরূহ। যদি ভিন্নদেশনিবাসী হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা সম্ভব যে, পূর্বকালে এতৎপ্রদেশস্থ মহীপগণ সময়ে সময়ে ভাস্করশিল্প-নিপুণ ব্যক্তিগণকে দেশান্তর হইতে স্বীয় রাজ্যে আনয়নপূর্বক প্রতিপালন করিতেন। সংখ্যার ন্যূনতা বশতই হউক কিংবা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, ইদানীং তাহাদিগের বংশ এতৎপ্রদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে ভাস্করবিদ্যাও বিলুপ্ত হইয়াছে।

পূর্ববর্ণিত দেবতামুড়া পর্বতের সমসূত্রে ১৫ মাইল পূর্বদিকে — সামান্য দক্ষিণ-কোণবর্তী পাষাণময় উচ্চভূমিতে 'রাইমা' ও 'সাইমা' নামক দুইটি পার্বত্য নদী মিলিত হইয়া একটি নির্ঝররূপে সবেগে নিম্নে পতিত হইতেছে। ইহাই ডম্বুর নামে প্রসিদ্ধ, 'গোমতী' নদীর উৎপত্তি স্থান। এই বারিধারা ত্রিপুরারাজ্য মধ্যে একটি সুবিখ্যাত জলপ্রপাত বলিয়া পরিগণিত।

এতদঞ্চল নিবাসী মগ, চাকমা ও রিয়াং প্রভৃতি অশিক্ষিত পার্বত্য জাতীয় লোকেরা উক্ত ঝরনাকে দেবতাবিশেষ মনে করে এবং এতৎকারণবশত তাহারা প্রায়শ এই অরণ্য সংকুল পর্বতময় স্থানে আগমন করিয়া ছাগ, মহিষ প্রভৃতি বলিদান-পূর্বক বর্ণিত জলপ্রপাতের পূজা করিয়া যায়।

অত্রস্থ একটি পর্বত-শিখরে পূর্বে এক সুদৃঢ় দুর্গ অবস্থিত ছিল বলিয়া কথিত আছে। অধুনা তাহার কোনো চিহ্নও বর্তমান নাই। এই স্থান ও উদয়পুরে গমনাগমন করিবার জন্য যে এক রাজপথ ছিল অদ্যাপি তাহার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। জনসাধারণ ইহাকে 'ডম্বুরের জাঙাল' নামে অভিহিত করে।

ভারত - সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ

সিরাজ্জুদ্দীন আমেদ
(১৯৪২-২০১০)

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন পরাধীন ভারতে। তাঁর জন্মের মাত্র চার বছর আগে জ্বলে উঠেছিল মহাবিদ্রোহের আগুন। এই আগুনের রেশ সমাজের ভেতরে তখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে। ভেতরে বারুদের গন্ধ, অথচ ওপরে বইছে শান্তির হাওয়া। মাত্র তিন বছর হল ভারতের শাসনভার চলে গেছে রানি ভিক্টোরিয়ার হাতে। পশ্চিমের সংস্কৃতি তখন ধীরে ধীরে অন্দরমহলে ঢুকছে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে দিচ্ছে পাকাপোক্ত হওয়ার নতুন প্রেরণা। কবি মধুসূদনের তুলিতে আঁকা হচ্ছে আর এক রাবণের ছবি। সে রাবণ জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়ে যাচ্ছে। সমাজ ও সাহিত্যের এইরকম সংগ্রামী পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের জন্ম।

রবীন্দ্রনাথ চোখ মেলে প্রথমেই দেখতে পেলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে। রামমোহনের পথ ধরে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের আলোয় খুঁজছেন ভারত-সংস্কৃতির মুখ। খুঁজছেন পরাধীনতার গ্লানি থেকে বাঁচবার এমন এক মন্ত্র যা গৌরবময় অতীতকে তুলে ধরবে। আর একই সঙ্গে দেবে পশ্চিমের নতুন 'হাওয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার আশ্বাস।'

ঠাকুরবাড়িতে তখন নানা মনীষীর আনাগোনা। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে তাঁরা করছেন জল্পনা-কল্পনা। কাঠে কাঠ ঘষলে যেমন আগুন জ্বলে ওঠে, তেমনি তাঁরা সকলে মিলে চাইছেন প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঘর্ষণ। জ্বালাতে চাইছেন নতুন ভারত-সংস্কৃতির শিখা। সে শিখা রবীন্দ্রনাথের চেতনাকেও স্পর্শ করল।

বাড়িতে পুরুষ মানুষের গায়ে চোগা-চাপকান। মাথায় জরির কাজ করা টুপি। আদব-কায়দা ও পোশাকে মুসলিম সংস্কৃতির গন্ধ। বয়স্কদের মধ্যে কেউ কেউ ফার্সি গজলের খুব ভক্ত। বয়স্ক মহিলারাও শাড়ির সঙ্গে গায়ে দিচ্ছেন শেমিজ। বাড়ির বউ

গুজরাতি ঢঙে শাড়ি পড়ে ঘোড়ায় চড়ছেন। মেজো দাদা সত্যেন্দ্রনাথ আই সি এস। বিলিতি কেতায় অভ্যস্ত। সেজো দাদা জ্যেতিরিন্দ্রনাথ ফরাসি সাহিত্যে মশগুল। তিনি পিয়ানোয় তুলছেন পাশ্চাত্য সংগীতের ঝড়। তার মাঝখানে বড়ো দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবিতা রচনা ও জ্ঞানচর্চায় সমর্পিত প্রাণ। এঁরা সকলেই চলতি হাওয়ার পন্থী। এই হল ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

এইরকম পরিবেশে মানুষ হয়ে রবীন্দ্রনাথ গেলেন বিলেতে। সেখানে ইস্কুলের পড়া বেশিদূর এগোল না। ফিরে এলেন তিনি। কিন্তু বিদেশে গিয়ে প্রথম জানতে পারলেন ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গো তার পার্থক্যটা। তিনি বহুবার বিদেশ ভ্রমণে গেছেন। প্রতিবারই তিনি নতুন করে চিনেছেন ভারত-সংস্কৃতিকে। যৌবনে তাঁকে নিতে হয়েছে জমিদারি দেখাশোনার ভার। তিনি গেছেন পূর্ববঙ্গের শিলাইদহে, পতিসরে, সাজাদপুরে। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পেরেছেন, ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতি ভারত-সংস্কৃতি নয়। তিনি দেখলেন, ভারত মানে হল গ্রামীণ ভারত। কৃষিনির্ভর তার অর্থনীতি। কিন্তু তা পুষ্ট নয়, পঙ্গু। পর্ণ কুটিরে, ম্যালেরিয়ায় প্লিহাগ্রস্ত হয়ে, অর্ধাহার-অনাহারে কঙ্কালসার লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ মানুষের মাঝখানে বসে আছেন ভারতমাতা। একটি হিসেব থেকে দেখা গেছে — ১৮৬০ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে ভারতে দুর্ভিক্ষ হয়েছে অন্তত কুড়িবার। ১৮৫৪ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে দুর্ভিক্ষে মারা গেছে ২ কোটি ৯০ লক্ষ ভারতবাসী। এরা প্রতিবাদ জানে না। জন্মচক্রকে তারা বিধির বিধান বলে মেনে নিয়েছে। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মানুষের সংস্কৃতিই হল ভারত-সংস্কৃতি। একথাটা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। আর সেজন্যই তিনি শহরে আর ফিরে যাননি। বোলপুরের রুক্ষভূমিতে গ্রামের কৃষিজীবীদের মাঝখানে বাকি জীবনটা তিনি কাটিয়ে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, ভারত-সংস্কৃতির মূল প্রাণসত্তা হল গ্রামীণ সংস্কৃতি। তাই এর পিছনের কৃষি-অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য — নোবেল প্রাইজের সব টাকা খরচ করেছিলেন। জামাই এবং ছেলেকে পড়িয়েছেন কৃষিবিদ্যা। সেকেলে চাষবাসের বদলে গ্রামের মানুষকে শিখিয়েছেন আধুনিক উন্নত প্রথার চাষ। আর এই গ্রামীণ সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করার জন্য শ্রীনিকেতনে খুলেছেন ইস্কুল। নতুন করে চালু করেছেন হলকর্ষণ উৎসব।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে বৈষ্ণব-সংস্কৃতির দিকেও ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু সেটা ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ ডিঙ্গিয়ে আর এগোয়নি। বৈষ্ণব সাহিত্য নির্ভর সংস্কৃতির আলোচনাও তিনি করেছেন। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেননি। বৌদ্ধ

সংস্কৃতি তাঁকে খুবই আকর্ষণ করেছিল। তিনি এর মধ্যে শাশ্বত মানবিকতাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। এখান থেকেই প্রেরণা পেয়ে তিনি ছুৎমার্গের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, লিখেছেন 'চণ্ডালিকা' নৃত্য-গীতি-নাট্য। আর ঔপনিষদিক সংস্কৃতির ভেতরের প্রাণপদার্থকে সঞ্চারিত করেছিলেন তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত ধ্যান ধারণায়। 'বিশ্বভারতী'র মধ্যে তার বাস্তব রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন।

এক কথায়, ভারত-সংস্কৃতির মূল প্রাণসত্তাকে তিনি আজীবন খুঁজে বেড়িয়েছেন। তাঁর কাছে ভারতের অতীত সংস্কৃতি যেমন মহনীয় হয়ে উঠেছে, তেমনি পাশ্চাত্য নতুন সংস্কৃতিকেও তিনি ঘরে নিয়ে এসেছেন। পুব-পশ্চিমের মিলনসাধনায় তিনি আজীবন ব্রতী হয়ে উঠেছিলেন। কারণ, দুটোর যে-কোনো একটায় নয়, বরং দুয়ের সমন্বয়েই ভবিষ্যৎ ভারত-সংস্কৃতির পথ খুলে যাবে, — এই ছিল তাঁর ধারণা। তাঁর এ ধারণার ছবি পাই 'গোরা' উপন্যাসে, 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে, রামমোহন-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রচিত অভিভাষণ দুটিতে এবং সর্বোপরি 'ভারততীর্থ' কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, ভারত-সংস্কৃতি কোনো দিনই বিশুদ্ধতা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। লোকজীবনের মূল মন্ত্র হল — 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।' তিনি ভরত রাজার আমলে ভারতের ঐক্যবদ্ধ রূপকে আবিষ্কার করেছেন। সেখানে দেখেছেন, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের একতা। সেই মিলনের ধারা এতই বেগমান ছিল যে, 'শক হুন দল মোগল পাঠান একদেহে হল লীন'। শংকরাচার্য, চৈতন্য, নানক, দাদু ও কবির বহু-বিচিত্র ভাবধারার মাঝে যে ঐক্যের পথ দেখিয়ে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে শ্রদ্ধা করেছেন। তিনি নিজেও ছিলেন সেই আদর্শের একজন মহান যোদ্ধা। তিনি জীবনের শেষদিকে গ্রামীণ ভারত-সংস্কৃতির একটা ভবিষ্যৎ রূপরেখা দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন 'অচলায়তন', 'রক্তকরবী', 'কালের যাত্রা' প্রভৃতি নাটক। এখানে তিনি দেখিয়েছেন — শ্রেণিবিভক্ত সমাজকে অবহেলিতরা ভেঙে ফেলে এক নতুন ভারত-সংস্কৃতি গড়ে তুলবে, যা সর্বহারার সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে যাবে। তাঁর 'ঐকতান' কবিতাতেও তার ছায়াপাত ঘটেছে।

তবু এই সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে ভারত-সংস্কৃতির একটা ঐক্যবদ্ধ রূপ। একে আমরা সংহতির সংস্কৃতিও বলতে পারি। তিনি তাঁর উপন্যাসের গোরা চরিত্রের মুখ দিয়ে বলেছিলেন — "আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান কোনো সমাজের বিরোধ নেই। আজ ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।" আজ প্রমাণ হয়ে গেছে, ভারত-সংস্কৃতির এই রূপটাই আসল। এবং এর রূপকার রবীন্দ্রনাথ।

সুভা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৮৬১-১৯৪১)

মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে। তাহার দুটি বড়ো বোনকে সুকেশিনী ও সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোটো মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে সুভা বলে।

দস্তুরমতো অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড়ো দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটোটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মতো বিরাজ করিতেছে।

যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে, ইহা সকলের মনে হয় না, এইজন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। সে যে বিধাতার অভিশাপস্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এ কথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু বেদনা কি কেহ কখনও ভোলে। পিতামাতার মনে সে সর্বদাই জাগরূক ছিল।

বিশেষত, তাহার মা তাহাকে নিজের একটা ত্রুটিস্বরূপ দেখিতেন। কেন-না, মাতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশরূপে দেখেন — কন্যার কোনো অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষরূপে নিজের লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন। বরঞ্চ, কন্যার পিতা বাণীকণ্ঠ সুভাকে তাঁহার অন্য মেয়েদের অপেক্ষা যেন একটু বেশি ভালোবাসিতেন, কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্বের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড়ো বিরক্ত ছিলেন।

সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল — এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিয়া উঠিত।

কথায় আমরা যে-ভাব প্রকাশ করি, সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়ে লইতে হয়, কতকটা তরজমা করার মতো; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু কালো চোখকে কিছু তরজমা করিতে হয় না — মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে, ভাব আপনি তাহার উপরে কখনও প্রসারিত হয়, কখনও মুদ্রিত হয়, কখনও উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখনও ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখনও অস্তমান চন্দ্রর মতো অনিমিষভাবে চহিয়া থাকে, কখনও দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিগ্‌বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মুখের ভাব বই আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই, তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর — অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি। এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্ব আছে। এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।

২

গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোটো নদী, গৃহস্থঘরের মতো; বহুদূর পর্যন্ত তাহার প্রসার নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা -না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন উচ্চতট; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুতপদক্ষেপে প্রফুল্লহৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।

বাণীকণ্ঠের ঘর একেবারে নদীর উপরেই। তাহার বাখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান নৌকাবাহীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থ্য সচ্ছলতার মধ্যে বোবা মেয়েটি কাহারও নজরে পড়ে কি না জানি না, কিন্তু কাজকর্মে যখনি অবসর পায় তখনি সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।

প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর, সমস্ত মিশিয়া চারি দিকের চলাফেরা-আন্দোলন-কম্পনের সহিত এক হইয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা — বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গি, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

এবং মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেয়া নৌকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ সমস্ত কাজকর্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক বিজন মূর্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত — একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে, আর-একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।

সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না, তাহা নহে। গোয়ালের দুটি গাভি, তাহাদের নাম সর্বশী ও পাঙ্গুলি। সে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখনও শুনে নাই, কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত — তাহার কথাহীন একটা করুণ সুর ছিল, তাহার মর্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝিত। সুভা কখন তাহাদের আদর করিতেছে, কখন ভর্ৎসনা করিতেছে, কখন মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মানুষের অপেক্ষা ভালো বুঝিতে পারিত।

সুভা গোয়ালে ঢুকিয়া দুই বাহুর দ্বারা সর্বশীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া তাহার কানের কাছে আপনার গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিত এবং পাঙ্গুলি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নিয়মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে যাইত, তাহা ছাড়া অনিয়মিত আগমনও ছিল; গৃহে যেদিন কোনো কঠিন কথা শুনিত, সেদিন সে অসময়ে তাহার এই মূক বন্ধু দুটির কাছে আসিত — তাহার সহিষ্ণুতা পরিপূর্ণ বিষাদশান্ত দৃষ্টিপাত হইতে তাহারা কী একটা অন্ধ অনুমানশক্তির দ্বারা বালিকার মর্মবেদনা যেন বুঝিতে পারিত, এবং সুভার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া অল্পে অল্পে তাহার বাহুতে শিং ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে নির্বাক ব্যাকুলতার সহিত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়াল শাবকও ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত সুভার এরূপ সমকক্ষভাবের মৈত্রী ছিল না, তথাপি তাহারা যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশুটি দিনে এবং রাত্রে যখন-তখন সুভার গরম কোলটি নিঃসংকোচে অধিকার করিয়া সুখনিদ্রার আয়োজন করিত এবং সুভা তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠে কোমল অঙ্গুলি বুলাইয়া দিলে যে তাহার নিদ্রাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইঙ্গিতে এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

৩

উন্নত শ্রেণির জীবের মধ্যে সুভার আরও একটি সঙ্গী জুটিয়াছিল কিন্তু তাহার সহিত বালিকার ঠিক কীরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ, সে ভাষাবিশিষ্ট জীব; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।

গোঁসাইদের ছোটো ছেলেটি — তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতান্ত অকর্মণ্য। সে যে কাজকর্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করিবে, বহু চেষ্টার পর বাপ-মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্মণ্য লোকের একটা সুবিধা এই যে, আত্মীয় লোকেরা তাহাদের উপর বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের প্রিয়পাত্র হয় — কারণ, কোনো কার্যে আবদ্ধ না থাকাতে তাহারা সরকারি সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। শহরে যেমন এক-আধটা গৃহ সম্পর্কহীন সরকারি বাগান থাকা আবশ্যক, তেমনি গ্রামে দুই-চারিটা অকর্মণ্য সরকারি লোক থাকার বিশেষ প্রয়োজন। কাজকর্মে আমোদ-অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে সেখানেই তাহাদিগকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান শখ — ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেকটা সময় সহজে কাটানো যায়। অপরাহ্নে নদীতীরে ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যাইত। এবং এই উপলক্ষ্যে সুভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। যে-কোনো কাজেই নিযুক্ত থাক, একটা সঙ্গী পাইলে প্রতাপ থাকে ভালো। মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ — এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝিত। এইজন্য, সকলেই সুভাকে সুভা বলিত, প্রতাপ আর-একটু অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া সুভাকে 'সু' বলিয়া ডাকিত।

সুভা তেঁতুলতলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদূরে মাটিতে ছিপ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল,

সুভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বোধ করি অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া ইচ্ছা করিত, প্রতাপের কোনো-একটা বিশেষ সাহায্য করিতে, একটা-কোনো কাজে লাগিতে, কোনোমতে জানাইয়া দিতে যে এই পৃথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয় লোক নহে। কিন্তু কিছুই করিবার ছিল না। তখন সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত — মন্ত্রবলে সহসা এমন একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য হইয়া যাইত, বলিত, 'তাই তো, আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা তো জানিতাম না।'

মনে করো, সুভা যদি জলকুমারী হইত; আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছধরা রাখিয়া সেই মানিক লইয়া জলে ডুব মারিত; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, রুপার অট্টালিকায় সোনার পালঙ্কে — কে বসিয়া? আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু— আমাদের সু সেই মণিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা। তাহা কি হইতে পারিত না, তাহা কি এতই অসম্ভব। আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজাশূন্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য করিতে পারিতেছে না।

৪

সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমে সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোনো-একটা পূর্ণিমাতিথিতে কোনো-একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নতুন অনির্বচনীয় চেতনাশক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছে না।

গভীর পূর্ণিমারাত্রে সে এক-একদিন ধীরে শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে, পূর্ণিমা-প্রকৃতিও সুভার মতো একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া — যৌবনের রহস্যে পুলকে বিষাদে অসীম নির্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত, এমনকি, তাহা অতিক্রম করিয়াও থমথম করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রান্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।

এ দিকে কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে। লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমনকি, একঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা যায়। বাণীকণ্ঠের সচ্ছল অবস্থা, দুই বেলাই মাছভাত খায়, এজন্য তাহার শত্রু ছিল।

স্ত্রীপুরুষে বিস্তর পরামর্শ হইল। কিছুদিনের মতো বাণী বিদেশে গেল।

অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, 'চলো, কলিকাতায় চলো।'

বিদেশযাত্রার উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। কুয়াশাঢাকা প্রভাতের মতো সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে একেবারে ভরিয়া গেল। একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কাবশে সে কিছুদিন হইতে ক্রমাগত নির্বাক জন্তুর মতো তাহার বাপমায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত — ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কী বুঝিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাঁহারা কিছু বুঝাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্ণে জলে ছিপ ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, 'কী রে, সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস? দেখিস্ আমাদের ভুলিসনে।' বলিয়া আবার মাছের দিকে মনোযোগ করিল।

মর্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করিয়াছিলাম', সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল; সেদিন গাছের তলায় আর বসিল না। বাণীকণ্ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয়নগৃহে তামাক খাইতেছিলেন, সুভা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বাণীকণ্ঠের শুষ্ক কপোলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

কাল কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। শুভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্যসঙ্গীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দুই চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল — দুই নেত্রপল্লব হইতে টপ টপ করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

সেদিন শুক্ল দ্বাদশীর রাত্রি। সুভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে পুষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল — যেন ধরণিকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবমাতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, 'তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না মা, আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো।'

কলিকাতার এক বাসায় সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া, অলংকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। সুভার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতেছে, পাছে চোখ ফুলিয়া খারাপ দেখিতে হয়, এজন্য তাহার মাতা তাহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু অশ্রুজল ভর্ৎসনা মানিল না।

বন্ধু-সঙ্গে বর স্বয়ং কনে দেখিতে আসিলেন — কন্যার মা-বাপ চিন্তিত, শঙ্কিত, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বলির পশু বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন। মা নেপথ্য হইতে বিস্তর তর্জন গর্জন শাসন করিয়া বালিকার অশ্রুস্রোত দ্বিগুণ বাড়াইয়া পরীক্ষকের সম্মুখে পাঠাইলেন।

পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'মন্দ নহে।'

বিশেষত, বালিকার ক্রন্দন দেখিয়া বুঝিলেন, ইহার হৃদয় আছে এবং হিসাব করিয়া দেখিলেন, যে-হৃদয় আজ বাপমায়ের বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে। শুক্তির মুক্তার ন্যায় বালিকার অশ্রুজল কেবল বালিকার মূল্য বাড়াইয়া দিল, তাহার হইয়া আর-কোনো কথা বলিল না।

পঞ্জিকা মিলাইয়া খুব একটা শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

বোবা মেয়েকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বাপ-মা দেশে চলিয়া গেল — তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।

বর পশ্চিমে কাজ করে। বিবাহের অনতিবিলম্বে স্ত্রীকে পশ্চিমে লইয়া গেল।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল, নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে চারি দিকে চায় — ভাষা পায় না, যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্মপরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না — বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল — অন্তর্যামী ছাড়া আর-কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।

এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।

বেড়া

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯০৮-১৯৫৬)

বাড়ির ঠিক মাঝখানে উঁচু চাঁচের বেড়া! খুব লম্বা মানুষের মাথা ছাড়িয়েও হাতখানেক উঁচু হবে। বেড়া ডিঙিয়ে কারও নজর চলবে না, অবশ্য যদি উঁচু কিছুর উপর দাঁড়িয়ে নজর চালানো না হয়। নজর দেবার অন্য উপায় আছে : ফুটোতে চোখ পাতা।

বাড়িটাকে সমান দু-ভাগ করেছে বেড়াটা, পশ্চিমের ভিটার লম্বা দাওয়া ভাগ করে, উঠান ভাগ করে সদরের বেড়ার চার হাত ফাঁকের ঠিক মাঝখান দিয়ে খানিক এগিয়ে বাড়িতে ঢুকবার এই ফাঁক আড়াল করতে দাঁড় করানো সামনের পর্দা-বেড়াটার ঠিক মাঝখানে গিয়ে ঠেকেছে।

আগে, প্রায় সাত বছর আগে, গোবর্ধন ও জনার্দনের বাপ অনন্ত হাতি যখন বেঁচে ছিল, তখন বাড়িতে ঢুকবার পথ ছিল একটা দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। এই পথের সামনেও বসানো ছিল একটা আড়াল-করা পর্দা বেড়া। ভাগের সময় পথটা পড়েছিল জনার্দনের ভাগে। সদরের বেড়ার আরেক প্রান্তে, অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব কোণে বেড়া কেটে নতুন একটা প্রবেশ-পথ করে নিতে অত্যন্ত অসুবিধা থাকায় গোল বেধেছিল। ঢুকবার-বেরোবার পথই যদি না থাকল, বাড়ির এমন ভাগ দিয়ে সে কী করবে — গোবর্ধন প্রতিবাদ জানিয়েছিল। মালিকদের মানতে হয়েছিল যে তার আপত্তি সংগত। অনেক মাথা ঘামিয়ে তারপর সালিশরা, যাদের প্রধান ছিলেন সদরের সেরেস্তাদারের বাবা প্রাণধন চক্রবর্তী জ্যোতির্বিদ্যাভূষণ, ব্যবস্থা দিয়েছিলেন ভাগের বেড়ার দু-পাশে সদর বেড়া দু-হাত করে কেটে দুই অংশের ঢুকবার-বেরোবার পথ করা হোক, আর পুরোনো পর্দা-বেড়া তুলে এনে স্থাপন করা হোক এই বিভক্ত পথের সামনে; কারণ

ও-বেড়াটাও দু-ভায়ের বাপের সম্পত্তি। অতএব দুজনের ওতে সমান অধিকার।

জনার্দন আপত্তি করে বলেছিল আড়াল-করা বেড়া সরালে সদর বেড়ার কোণের পুরোনো পথের ফাঁকে রাস্তার লোক যে তার বাড়ির বউ-ঝিদের দেখতে পাবে, তার কী হবে? সে এমন কী অপরাধ করেছে যে, গাঁটের পয়সা খরচ করে তাকে বন্ধ করতে হবে বেড়ার ফাঁক! রীতিমতো সমস্যার কথা। সালিশরা যখন মীমাংসা খুঁজতে মাথা ঘামাচ্ছেন, গোবর্ধন উদার ও উদাসভাবে বলেছিল, তিন হাত বেড়ার ফাঁক বন্ধ করার পয়সা খরচ করতে যদি জনার্দনের আপত্তি থাকে, সে এদিকের অংশ নিক। সদর বেড়ার ফাঁকের অসুবিধা ভোগ করতে গোবর্ধন রাজি আছে।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সালিশরা হঠাৎ সমস্যাটার চমৎকার মীমাংসা আবিষ্কার করেন। কেন, দু-পাশে দু-হাত করে পথ করতে সদর বেড়ার মাঝখানে চার হাত অংশ তো কাটতেই হবে, তাই দিয়ে অনায়াসে বন্ধ করা যাবে জনার্দনের অংশের সদর বেড়ার পুরোনো ফাঁক!

এমনি দুর্যোধনী জেদি হিংসার চুলচেরা ভাগাভাগির প্রতীক হয়ে ভাগের বেড়াটি দাঁড়িয়ে আছে সাত বছর। অনন্ত হাতির শ্রাদ্ধের দশ দিন পরে বেড়াটা উঠেছিল। আদালত কুরুক্ষেত্রে তারপর যত লড়াই হয়ে গেছে দু-ভায়ের মধ্যে জমিজমা নিয়ে, যত হাতাহাতি গালাগালি হয়ে গেছে বাগানের ফল, পুকুরের ঘাট, গাছের মরা ডালের ভাগ নিয়ে তারও যেন প্রতীক হয়ে আছে এই বেড়াটিই। জীর্ণ হয়ে এসেছে বেড়াটা, এখানে ওখানে মেরামত হয়েছে, আর এখানে পড়েছে মাটির চাবড়া, ওখানে গোঁজা হয়েছে ন্যাকড়া, সেখানে সাঁটা হয়েছে কাগজ।

বেড়ার ফুটোয় চোখ রেখে উঁকি মারা চলত — দু-পাশ থেকেই। হঠাৎ গোবরগোলা জল বেড়া ডিঙিয়ে এসে পড়ত গায়ে। গোবর্ধনের মেয়ে পরিবালা একদিন চোখ পেতে আছে বেড়ার ফুটোয়, জনার্দনের মেয়ে তাকে তাকে থেকে একটা কঞ্চি সেই ফুটো দিয়ে চালান করে দিল তার চোখের মধ্যে। চোখ যায় যায় হল পরিবালার, মাথা ফাটে ফাটে হল গোবর্ধন ও জনার্দন দু-ভায়ের, ক-দিন পাড়ায় কান পাতা গেল না দু-বাড়ির মেয়েদের গলাবাজিতে। বেড়ায় কাঁথা-কাপড় শুকতে দিলে অদৃশ্য হয়ে যেত। এঁটো-কাঁটা, নোংরা, ছেলেমেয়ের মল বেড়া ডিঙিয়ে পড়ত একপাশ থেকে অন্যপাশে। এ পাশের পুঁই বেড়া বেয়ে উঠে ও পাশের আয়ত্তে একটি ডগা

একটু বাড়ালেই টেনে যতটা পারা যায় ছিঁড়ে নেওয়া হত। বেড়া ডিঙিয়ে অহরহ আসা-যাওয়া করত সমালোচনা, মন্তব্য, গালাগালি, অভিশাপ। চেরা বাঁশের বেড়াটাকে মাঝে রেখে এমন একটানা শত্রুতা চলত দু-পাশের দুটি পরিবারের মধ্যে যে, সময় সময় মনে হত কবে বুঝি ওপাশের চালা পুড়িয়ে দেবার ঝোঁক সামলাতে না পেরে এপাশে নিজের চালাতেই আগুন ধরিয়ে দেয়!

গোলমাল এখনও চলে, বিদ্বেষ এখনও বজায় আছে পুরো মাত্রায়। তবে গোড়ার দিকের মতো খুঁটিনাটি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অহরহ হাঙ্গামা চলে না, গায়ে পড়ে সহজে কেউ ঝগড়া বাধায় না। ঢিলটি মারলে যে পাটকেলটি খেতে হবে দু-পাশের মানুষগুলি সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে সংযম অভ্যাস করতে বাধ্য হয়েছে। আক্রমণাত্মক হিংসা কমে এসে এখন দাঁড়িয়েছে ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অবহেলাত্মক মনোভাবে। খোঁচাবার ও গায়ের ঝাল ঝাড়বার প্রক্রিয়াও ক্রমে ক্রমে বেশ কৌশলময় ও মার্জিত হয়ে উঠেছে। এপাশের ছেলেমানুষ কানাই মাঝের বেড়ার মাহাত্ম্য ভুলে ও-পাশে সমবয়সি বলাইয়ের সঙ্গে খেলতে গেলে, শত্রুপক্ষের ছেলেকে আয়ত্তে পেয়েও ও-পাশের কেউ তাকে ধরে পিটিয়ে দেয় না, আচ্ছা করে মার দেওয়া হয় বলাইকে। এ-পাশ থেকে হাঁক ওঠে, কানাই! কানাই এলে তাকে চড়চাপড় মেরে উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করা হয়, ও-বাড়ি মরতে গেছিলি কেনরে, বেহায়া পাজি বজ্জাত? ও-পাশ থেকে জবাব আসে বলাই-এর প্রতি আরও জোর গলায় শাসানোতে, ফের যদি ও বাড়ির কারো সাথে তুই খেলিস হারামজাদা নচ্ছার ...

দু-পাশেই ছেলেমেয়ে আছে, হাজার বলে তাদের বোঝানও যায় না যে, বেড়ার ও-পাশ যেতে নেই। ছেলেমেয়েরা তাই নিরাপদ থাকে। তবে কুকুর বেড়ালের রেহাই নেই। এপাশের বেড়াল ও-পাশে হাঁড়ি খেতে গেলে তার রক্ষা থাকে না।

দু-পাশের হাঁড়িই যখন প্রায় শূন্য থাকছে দুর্ভিক্ষের দিনে, জনার্দনের ছেলে চন্দ্রকুমারের বউ রানিবালার পোষা বিড়ালটা মেউ মেউ করে বেড়াচ্ছে খিদেয় কাতর হয়ে, গোবর্ধন একদিন কোথা থেকে জোগাড় করে নিয়ে এল আধসেরি একটা রুইমাছ। মাছ দেখে খুশি হয়ে হাসি ফুটল সবার মুখে, দু-মুঠো চাল সেদিন বেশি নেওয়া হল এই উপলক্ষ্যে। গোবর্ধনের ছেলে সূর্যকান্তের বউ লক্ষ্মীরানি আঁশবঁটি পেতে কুটতে বসল মাছ।

মাছ কাটা শেষ হয়েছে, কাছে দাঁড়িয়ে সূর্যকান্ত বউয়ের দিকে গোড়ায় যেমন তাকাত প্রায় সেই রকম সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাছের দিকে, কোথা থেকে রানিবালার আদুরে বিড়াল এসে এক টুকরো মাছ মুখে তুলে নিল। মাছকাটা বঁটিটা তুলেই সূর্যকান্ত বসিয়ে দিল এক কোপ। রানিবালার আদুরে বিড়াল একটা আওয়াজ পর্যন্ত না করে মরে গেল। মাছের টুকরোটা মুখ থেকে খসে পড়ায় লক্ষ্মীরানি সেটা তুলে রাখল চুপড়িতে।

পথের ধার থেকে মরা বিড়ালটা কুড়িয়ে নিয়ে গেল চণ্ডী বসাক। চাল ছিল না কিন্তু ঘরে তার একটু নুন আর একটু হলুদ-লংকা ছিল। ঘুরে ঘুরে হত্যা দিয়ে দুটি খুদকুঁড়ো চণ্ডী জোগাড় করে নিয়ে এল। ঝাল ঝাল বিড়ালের মাংস দিয়ে সে-দিন সে দু-বেলা ভোজ খেল সপরিবারে।

হত্যাকাণ্ডের খবরটা রানিবালা পেল পাঁচুর মার কাছে। ও-বাড়িতে পাঁচুর মা দুটি চালের জন্য গিয়েছিল, অনেকক্ষণ ধন্না দিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত পায়নি। নিজের চোখে সে ঘটনাটা দেখেছে আগাগোড়া। এ কী কাণ্ড মা, ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করিস, হিংসে করে মা-ষষ্ঠীর বাহনকে মারলি একাদশীর দিন, এত শত্রুতা?

'দুটি চাল দিবি বউ? দে মা, দুটি চাল? বিড়াল ছানা দেব তোকে একটা, তোর পায়ে ধরি খুদকুঁড়ো যা হোক দুটি দে।'

'কোথা পাব গো? চাল বাড়ন্ত। খুদকুঁড়ো শাউড়ি আগলে আছে।'

বলে বিড়ালের শোকে রানিবালা কাঁদতে থাকে, বাড়ির সকলের কাছে নালিশ জানায়। সামলাতে না পেরে ডুকরে কেঁদে ওঠে, অভিশাপও দিয়ে বসে ও-পাশের খুনেদের। ছেলেবেলা থেকে রানিবালা বিড়াল পুষতে ভালোবাসে, কত পোষা বিড়াল তার মরে আর হারিয়ে গেছে। ও-বাড়ির লোক হত্যা না করলে হয়তো বিড়ালটার জন্য এত শোক তার হত না।

কিন্তু এমনি অবাক কাণ্ড, এই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধানোর বদলে জনার্দন তাকেই ধমক দিয়ে বলল, 'আঃ চুপ কর বাছা। বাড়াবাড়ি কোরো না।'

চন্দ্রকান্তও প্রায় ধমকের সুরে বলল, 'তোমার বিড়াল যায় কেন চুরি করে খেতে?'

রানিবালা হকচকিয়ে যায়, ভেবে পায় না ব্যাপারখানা কী। রাগে অভিমানে তার

গা জ্বালা করে, ভাবে না খেয়ে শুয়ে থাকবে কিন্তু ভরসা পায় না। কারও পেট কলমিশাক-সেদ্ধ দিয়ে দুটি ভাত খেয়ে ভরে না। কেউ যদি তাকে খাওয়ার জন্য সাধাসাধি না করে সে না খেয়ে গোসা করে শুয়ে থাকলেও !

চন্দ্রকান্ত তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয় — পুলপারের জমিটা না বেচে আর উপায় নেই। গোবর্ধন ও জনার্দন দুজনে মিলে না বেচলে জমিটা বেচবারও উপায় নেই। কাল দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করছে প্রাণধন চক্রবর্তীকে জমিটা বেচে দেবে। এখন কোনো কারণে গোবর্ধন বিগড়ে গিয়ে বেঁকে বসলে মুশকিল হবে।

'ঝগড়াঝাটি কোরো না খবরদার, ক-দিন মুখ বুজে থাকো।'

বিড়াল মারার সময় গোবর্ধন উপস্থিত ছিল না। ফিরে এসে ব্যাপার শুনে সে-ও অসন্তুষ্ট হয়ে সূর্যকে বলে, 'একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোদের? এমনি করে ফ্যাকড়া বাধাও, ব্যাস, জমি বেচাও খতম। খেয়ো তখন কচুপোড়া সিদ্ধ করে। খবরদার, কেউ ঝগড়া করবে না ওদের সাথে। মুখ বুঝে থাকো ক-দিন।'

সাত বছরের শত্রুতা স্বার্থের খাতিরে একদিনে হঠাৎ স্থগিত হয়ে গেল। দু-পারেই কটু কথা যদি বা কিছু বলা হল, হল চুপি চুপি, চাপা গলায়, নিজেদের মধ্যে। এপার কথা বলল না বটে ওপারের সঙ্গে সোজাসুজি কিন্তু ওপারকে শোনাবার জন্য এবার চেঁচাল, 'ও কানাই, ওদের বেগুন খেতে গোরু ঢুকেছেরে।' ওপারও চেঁচাল এপারকে শুনিয়ে 'ও বলাই, ওদের পুঁটু পুকুরপাড়ে একলা গেছেরে।' আমতলায় কানাই বলাইকে খেলতে দেখে কোনো পার কিছু বলল না। এপারের ছেলে ওপারে যাওয়ায় ওপারের ছেলে চড় খেল না। লক্ষ্মীরানির বিড়াল প্রায় সারাটা দুপুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইল ওপারের দাওয়ার কোণে জড়ো করা ছেঁড়া চটে। হাতটা মনটা বারবার নিসপিস করে উঠলেও রানিবালা পর্যন্ত তাকে কিছু বললে না। ওপারের পুঁই গাছের সতেজ ডগাটি লক লক করে বাতাসে দুলতে লাগল এপারের এলাকায় !

কথা যা বলাবলি হল তিন দিনে দু-পারের মধ্যে, তা শুধু গোবর্ধন আর জনার্দনের জমি বিক্রি নিয়ে গম্ভীর নৈর্ব্যক্তিক কথা, তবু এভাবেও তো সাত বছর তারা কথা বলেনি।

দলিল রেজিস্ট্রি করিয়ে টাকা পাবার দিন সকালে বেড়ার এপার থেকেই গোবর্ধন

বলে, ‘কখন রওনা হবে, জনা?’

‘এই খানিক বাদেই,’ জবাব দিয়ে, একটু থেমে জনার্দন যোগ দেয়, ‘ফেলনার জ্বরটা বেড়েছে।’

ফেলনা রানিবালার ছেলে।

একসাথে বেরোয় দুজনে, জনার্দন ডাক দিয়ে নিয়ে যায় গোবর্ধনকে। একসাথে বাড়ি থেকে বেরোবার কোনো দরকার অবশ্য ছিল না। চক্রবর্তীর বাড়ি হয়ে তারা সাব রেজেস্ট্রারের অফিসে রওনা হবে, একে একে গিয়ে সেখানে জুটলেও চলত। কিন্তু সাত বছর বিবাদ করে আর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কাটাবার পর দু-ভাই যখন শান্তভাবে ক-দিন ধরে কথা বলে, তখন কী আর দরকার আছে অত হিসেব করে সব কাজ করার! দুজনে চলতে থকে একরকম নির্বাক হয়েই। মাঝে মাঝে এ ওর মুখের দিকে তাকায় আড়চোখে। সাত বছরের দুজনের বয়স যেন বিশ বছর বেড়ে গেছে সংসারের চাপে, দুর্ভিক্ষের গত দু-বছরেই যেন বেশি বেড়েছে। ভবিষ্যতে আরও কী আছে ভগবান জানেন!

‘দরটা সুবিধা হল না।’

‘উপায় কী?’

‘ডবল দরে এমন জমি মিলবে না।’

‘ঠিক। লতিফের সেচা জমির চেয়ে ভালো ফসল দিয়েছে গতবারে।’ গোবর্ধন এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে পড়ে। — ‘শোনো বলি, জনা। না বেচলে হয় না জমিটা? এক কাজ করি আয়। না বেচে বাঁধা রাখি, পারি তো ছাড়িয়ে নেব দুজনে মিলে।’

‘চক্কোত্তি মশায় কি রাজি হবে?’

‘রাজি না হয় তো মধু সা-র কাছে বাঁধা দেব। নয়তো রথতলায় নিকুঞ্জকে। বেচে দিলে তো গেল জন্মের মতো। যদি রাখা যায়!’

গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোবর্ধন ও জনার্দন — অনন্ত হাতির দুই ছেলে, কথাটা বিচার ও বিবেচনা করে দেখতে থাকে। দেখে লোকের মনে হয় যেন আলাপ করছে দুটি সাঙাত।

এদিকে জ্বর বাড়তে বাড়তে ফেলনার যায় যায় অবস্থা হয় দুপুর-বেলা। চাঁচের বেড়া থাকলেও ওপারে সব টের পায় সবাই। সূর্যের মা ইতস্তত করে অনেকক্ষণ ফিস ফিস করে সূর্য আর লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করে কয়েকবার, 'যাব নাকি?' তারপর বেলা পড়ে এলে সতীরানির বিনুনি কান্না শুনে হঠাৎ মনস্থির করে সাত বছর পরে সূর্যের মা বেড়ার ওপারে যায়, আস্তে আস্তে গিয়ে বসে ফেলনার শিয়রে চাঁদের মার পাশে। সন্ধ্যার আগে ফেলনা মারা গেলে মড়া-কান্না শুনে এপারের বাকি সকলেও হাজির হয় ওপারে। সাত বছরে পাঁচবার মড়া-কান্না উঠেছে জনার্দনের অংশে, কিন্তু গোবর্ধনের অংশ থেকে বেড়া পেরিয়ে কেউ কখনও আসেনি। সাত বছর পরে আজ বেড়ার দু-দিকের মেয়েরা বেড়ার একদিকে হয়ে একসঙ্গে কাঁদতে আরম্ভ করে। চাঁদ শোকের নেশায় পাগলের মতো কাণ্ড আরম্ভ করলে সূর্য তাকে ধরে রাখে। একটু রাত করে গোবর্ধন ও জনার্দন যখন বাড়ি ফেরে তখনও দেখা যায় ওপারের প্রায় সকলেই রয়েছে এপারে, ওপারের ছেলেমেয়েগুলি ঘুমিয়ে পড়েছে এপারের মাদুরে কাঁথায়, এপারের ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে।

তাই বলে যে খিটিমিটি ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ হয়ে গেল দু-পারের মধ্যে চিরদিনের জন্য, উঠানের মাঝখানে পুরোনো চাঁচের বেড়াটা থেকেও রইল না, তা নয়। মানুষ তাহলে দেবতা হয়ে যেত। তবে পরের আশ্বিনের ঝড়ে পচা বেড়া পড়ে গেলে সেটা আবার দাঁড় করবার তাগিদ কোনো পারেরই দেখা গেল না। বেড়াটা ভেঙে জ্বালান হতে লাগল দু-পারেরই উনানে। দু-পারের ঝাঁটার সঙ্গেও সাফ হয়ে যেতে লাগল বেড়ার টুকরো আবর্জনা। শেষে একদিন দেখা গেল দাওয়ার বেড়াটি ছাড়া উঠানে বেড়ার চিহ্নও নেই, বাড়ির মেয়েদের ঝাঁটায় দুটির বদলে একটি উঠান তকতক করছে।

ক্যানভাসার

বনফুল

(১৮৯৯-১৯৭৯)

কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যায়নী।

কাত্যায়নীর বাক্যস্ফুলিঙ্গ যখন ভৈরবের চিত্ত-বারুদে নিপতিত হইয়া অন্তর্বিপ্লব ঘটাইতেছিল, সেই সময়টিতেই ক্যানভাসার হিরালালের সহিত যদি ভৈরবের দেখা না হইত তাহা হইলে এই কাণ্ডটি ঘটিত না।

কাত্যায়নীর বহুকাল হইতে একটি শৌখিন শাড়ি কেনার শখ।

বেকার ভৈরব অর্থাভাবপ্রযুক্ত সে শখ মিটাইতে পারে নাই। কিন্তু স্ত্রীকে এই স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে চাহে যে, বাবুয়ানি জিনিসটা সে অপছন্দ করে এবং এইসব বিলাস-লালসার ফলেই দেশটা উচ্ছন্ন যাইতেছে। সুতরাং —

কাত্যায়নী পতিব্রতা হইলেও স্তোক-বাক্যে ভুলিবার পাত্রী নহেন।

তিনি বলিলেন — "যার হাই তুলতে চোয়ালে খিল ধরে, তার আবার বন্দুক ঘাড়ে করতে যাওয়া কেন? এক কড়ার মুরোদ নেই, বিয়ে করতে যাওয়া কেন তার?"

নিদারুণ কথা!

উত্তপ্ত ভৈরব খানিকটা তেল মাথায় চাপড়াইয়া হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। বাহির হইয়াই সম্মুখে দেখিল নিমগাছ। সকাল হইতে দাঁতন পর্যন্ত করা হয় নাই। ভৈরব নিমগাছটার একটা ডাল নোয়াইয়া মটাস করিয়া একটা দাঁতন ভাঙিল।

"মাজন চাই — ভালো দাঁতের মাজন —"

ভৈরব ফিরিয়া দেখে, একটি সম্পূর্ণ অচেনা ভদ্রলোক একটি ছোটো সুটকেস হাতে করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

মুখে মৃদু হাসি।

ক্যানভাসার হিরালাল।

ক্যানভাসার হিরালালের এই পল্লিগ্রামে আসিবার কথা নয়। তাহার শহরে যাইবার কথা। যাইতেওছিল — কিন্তু ট্রেনে ঘুমাইয়া পড়াতে বেচারা 'ওভারক্যারেড' হইয়া এই পল্লিগ্রামে নীত হইয়াছে।

সন্ধ্যার আগে ফিরিবার ট্রেন নাই। যদি কিছু 'বিজনেস' হয় এই আশায় বেচারা দুপুর রোদেও চতুর্দিকটা একবার ঘুরিয়া দেখিতেছে।

বিস্মিত ভৈরব কহিল — "আপনি এখানে কোত্থেকে এলেন মশাই?"

"মাজন আছে — ভালো দাঁতের মাজন। দাঁতের পোকা, দাঁতের গোড়া ফোলা, পুঁজ পড়া, রক্ত পড়া, মুখে গন্ধ — সব ভালো হয়ে যাবে মশাই — ভালো মাজন আছে —"

"তা তো আছে, কিন্তু আপনি এলেন কোথা থেকে? এই পাড়াগাঁয়ে আমরা একটু শান্তিতে আছি, আপনারা এসে জুটলেই তো —"

"ব্যবহার করে দেখুন — ভালো মাজন —"

নিমের দাঁতনটা চিবাইতে চিবাইতে ভৈরব বলিল — "কচু!"

হাসিয়া হিরালাল বলিল — "আজ্ঞে না, ভালো মাজন। ব্যবহার করে দেখুন —"

হিরালালের ঝকঝকে দাঁতগুলির পানে চাহিয়া বলিল — "আপনার দাঁতগুলি তো খাসা — এই মাজনই ব্যবহার করেন না কি?"

আর একটু হাসিয়া হিরালাল বলিল — "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ভৈরব একবার পিচ ফেলিয়া বিকশিত সম্মুখের দন্তগুলিতে নিমের দাঁতন ঘষিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, দৃশ্যটি নয়নাভিরাম নহে।

"মাজন নেবেন কি এক কৌটো?"

বিকৃত-মুখ ভৈরব বলিল — "সরে পড়ুন মশাই। আপনারা হচ্ছেন দেশের শত্রু। দুনিয়ার যত শৌখিন বাজে জিনিস জুটিয়ে এনে আপনারা দেশটাকে রসাতলে দিচ্ছেন। বুঝলেন?"

বলিয়া সে নির্বিকারভাবে দাঁতন ঘষিতে লাগিল।

হিরালাল সুন্দর দন্তগুলি বিকশিত করিয়া আর একবার হাসিল। বলিল — "বুঝতে পারলাম না আপনার কথা। দেশে দন্তরোগের তো অভাব নেই।"

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া এবার ভৈরব কহিল — "তাতে আপনার কী? বেরিয়ে যান আপনি এ গাঁ থেকে। ওসব মাজন-ফাজন বুজরুকি এখানে চলবে না —"

হিরালাল ক্যানভাসার হলেও রক্ত-মাংসের মানুষ। সুতরাং বলিল — "আপনিই কি এই গ্রামের মালিক?"

যুক্তিযুক্ত হইলেও এই উক্তি ভৈরবের আত্মসম্মানে আঘাত করিল। ভৈরব বেকার তাহা সত্য, তাহার পেটে বিদ্যা নাই তাহা সত্য; কিন্তু তাহার গায়ে শক্তি আছে তাহাও সত্য। যদিও সে গ্রামের মালিক নহে, কিন্তু সে ইহাকে গ্রামছাড়া করিতে পারে। এইসব জুয়াচোরগুলা দেশের যত অপরিণামদর্শী যুবক-যুবতিগুলিকে খেপাইয়া তুলিয়াছে।

গ্রাসাচ্ছাদন জোটানোই দুষ্কর — দাঁতের মাজন!

সবেগে পিচ ফেলাইয়া ভৈরব কহিল — "বেরিয়ে যান বলছি আপনি গাঁ থেকে।"

"গাঁ থেকে বার করে দেবার কে মশাই আপনি শুনি?"

ভীম গর্জনে ভৈরব কহিল — "বেরিয়ে যান —"

"আপনার মতো ঢের মিঞা দেখেছি মশাই।"

ইহার পরই কিন্তু ভৈরব ছুটিয়া হিরালালের গণ্ডদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিল।

ভৈরবের ব্যবহার আশ্চর্যজনক সন্দেহ নাই।

কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্যজনক আর এক কাণ্ড ঘটিল। চড় খাইয়া হিরালাল সঙ্গে সঙ্গে ফোকলা হইয়া গেল। তাহার বাঁধানো দন্তপাটি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

স্তম্ভিত ভৈরব তাহার কালো কুচকুচে গোঁফ জোড়াটার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া হিরালাল একটু হাসিয়া বলিল — "আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটাও। ভালো কলপও আমি রাখি। নেবেন? কেন মার-ধোর করছেন মশাই? গরিব মানুষ — এই করেই কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে —"

হতভম্ব নির্বাক ভৈরবের বাক্যস্ফূর্তি হইলে সে বলিল — "আচ্ছা, দিন এক কৌটো মাজন!"

সাদা ঘোড়া

রমেশচন্দ্র সেন

(১৮৯৪-১৯৬২)

দাঙ্গার সময়ের একটি ঘটনা।

ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন রক্তস্নানের পর কলিকাতার অবস্থা একটু শান্ত হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানেরা নিজ নিজ পল্লিতে কিছুটা নিঃসংকোচে হাজির হয়। কিন্তু কেমন যেন থমথমে ভাব।

একদিন বৈকালে শূন্য ঠিকা গাড়ির স্ট্যান্ডে সাদা রংয়ের একটি ঘোড়া দেখা গেল। ধবধবে সাদা, শরীরের কোথাও একটা দাগ পর্যন্ত নাই। চামরের মতো তার সুন্দর ল্যাজের গোছার উপর রোদ ঝলমল করে। প্রাণীটি যেন পথভোলা এক পথিক। এ পাড়ায় আগে কেহই তাহাকে দেখে নাই। আশ্রয় হারাইয়া, আশ্রয়দাতাকে হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এ পাড়ায় আসিয়াছে। ক্ষুধার জ্বালায় খালি রাস্তা শোঁকে। তার নিশ্বাসে নিশ্বাসে পথের ধুলা ওড়ে কিন্তু বেচারা কোথাও কিছু পায় না। শুধু আবর্জনার দুর্গন্ধময় স্তূপ শুঁকিয়া শুঁকিয়া মুখ ফিরাইয়া নেয়। জানালা দিয়া দেখিয়া, শীলার মা বলিলেন — বেচারি হয়তো কিছুই খেতে পায় না। সইস কোচোয়ান ফেলে পালিয়েছে। তাঁর নববিবাহিতা কন্যা শীলা কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, কেউ হয়তো তাদের মেরে ফেলেছে।

এ্যাঁ — শীলার মার মুখখানা একেবারে কালো হইয়া যায়। এই মহিলা কয়দিনে একটি মৃত্যুও দেখেন নাই। কিন্তু নিজের চোখে দু-একটা নৃশংস ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়াছেন। আর হত্যার কাহিনি শুনিয়াছেন অজস্র, হত্যা এবং হত্যার চেয়েও নির্মম। শুনিয়া শুনিয়া গা মিন মিন করে, অরুচি হয়। আসে অনিদ্রা। তবুও মানুষ যে এতো নৃশংস হইতে পারে তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে চান না। বলেন সইস কোচোয়ান বেঁচে থাকতেও তো পারে।

দাঙ্গাবিধ্বস্ত পল্লিতে সাদা এই জানোয়ারটা যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার করিল। তাহাকে লইয়া ছেলের দল মাতিয়া উঠিল। একেবারে ছোটোরা দূর হইতে দেখিয়াই খুশি হয়। বড়োরা তার গায়ে হাত বুলায়। ঘাড়ে হাত দিলে ঘোড়াটাও আনন্দে চিঁহি চিঁহি করে। তাকে লইয়া জল্পনা-কল্পনা চলে নানারকম। প্রায় সকলেই সিদ্ধান্ত করে, কোনো রাজার কিংবা জমিদারের ঘোড়া হইবে। তারপরই ওঠে খাদ্যের কথা, বড়োলোকের ঘোড়া কী খায়, কতোটা পরিমাণ খায়। একজন বলে, জানিস ওরা মদ খায়, বিলিতি মদ! নন্তে মন্তব্য করে — মদ না খেলে এতো তেজি হয়? একটি ছেলের দুর্বুদ্ধি হইয়াছিল। ঘোড়াটা সম্ভবত ছেকরা গাড়ির। সঙ্গে সঙ্গেই হাসির রোল ওঠে। নন্তে বলে, কতো ঘোড়াই না তুই দেখেছিস। তোদের বিলেন দেশে জুড়ি চৌ ঘুড়ি চলে কি না? এই আলোচনার মধ্যেই ঘোড়ার মুখে দড়ির লাগাম পরাইয়া যমুনাপ্রসাদ তার পিঠে চাপিয়া বসিল, হাতে নিল একটা ছোট্ট ছড়ি। ছেলেটির বয়স বাইশ-তেইশ, রং কালো। ছিপছিপে গড়ন। গায়ে একটা গেঞ্জি। সে বায়োস্কোপের টিকিট কিনিয়া চড়া দামে বুকিং ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া সেই টিকিট বেচে। ফুটপাথের উপর জুয়া খেলিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে লাভের কড়ি উড়াইয়া দেয়। কিছু অবশিষ্ট থাকিলে খাঁটি খাইয়া চিল্লাচিল্লি করে।

কিন্তু দাঙ্গার এই কয়দিনে সে বেশ লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। যখনই পল্লির বা নিকটের দেবমন্দির আক্রান্ত হয় তখনই সর্বাগ্রে শোনা যায় যমুনার কণ্ঠস্বর। সে সকলের আগে ছুটিয়া চলে। গোরা সৈন্যদের চা ও সিগারেট খাওয়াইয়া যমুনা তাদের সঙ্গেও বেশ ভাব করিয়া ফেলিয়াছে। ছেলেরা তাকে ডাকে মিলিটারি টি ক্যাপ্টেন। কিন্তু এই দুই দিন তাহার আর কিছু করার অবকাশ হয় নাই। প্রায় সব সময়ই ঘোড়ার উপর থাকে। বলে হাম সার্জন বনগিয়া। ছেলের দল তার পিছনে পিছনে ছোটে। দু-একবার কেহ হয়তো বলে, তুমি একবার নাম না যমুনা, আমরা একবার উঠি দেখি। যমুনা কোনো জবাব দেয় না, ভ্রূক্ষেপ করে না, শুধু তালুতে জিভ ঠেকাইয়া শব্দ করে টক টক। হাবুল বলে — বাঃ, তুমি ঘোড়ায় চড়বে, আর আমরা বসে দেখবো — সে হবে না। যমুনা বলে, যা মোড়ের দোকানসে পান ঔর সিগারেট নে আয়, তারপর চড়বি। পয়সা? হামার নাম করবি — বলবি, যমুনা প্রসাদ মাংছে। মিনিট দুই-তিন পরে হাবুল আসিয়া বলিল — দিলে না, বললে, পৈসা লে আও। "শালা, ভেড়িকা বাচ্চা। শালার দুকান বাঁচিয়ে ছিলাম। জুয়াসে ভি কতো পয়সা নাফা করল। আভি পানকো ওয়াস্তে দোগে পয়সা মাংছে" বলিয়া

যমুনা পানের দোকানের দিকে ঘোড়াটা চালাইয়া দিল। হাবুলের আর ঘোড়ায় চড়া হইল না। অন্যবার এই সময় ছেলেরা সার্বজনীন পূজা-মণ্ডপে ভিড় করে। পটুয়া খড় দিয়া কাঠামো করে, মাটি ছানে, কাঠামোয় মাটি দেয়। ছেলের দল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে। টুকিটাকি জিনিসপত্র আগাইয়া দিয়া পটুয়াকে সাহায্য করিয়া কতই না আনন্দ পায়। এবার এখনও মণ্ডপ ওঠে নাই। ছেলেরা সারাদিন ঘোড়াটাকে লইয়া ব্যস্ত। তারা তার নাম দিয়াছে চাঁদ, চাঁদের রংয়ের ঔজ্জ্বল্য ও কান্তি দিনের পর দিন ম্লান হয়। সে পা টানিয়া টানিয়া চলে। পিছনের বাঁ পায়ে ছোট্ট একটি দগদগে ঘা।

লীলার বাবা হৃষীকেশবাবু পাড়ার প্রবীণ লোক, ছেলেদের মুরব্বি স্থানীয়। তিনি হাবুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন — ঘোড়াটাকে খেতে দিস তো রে? হাবুল মন্তব্য করে — নন্তুদা বোধ হয় দেয়। নন্তেকে প্রশ্ন করিলে সে বলিল, আমি তো জানি না, যমুনা বলতে পারে। স্বামীর নিকট ব্যাপার শুনিয়া শীলার মা নন্তেকে দিয়া বাড়ির নীচের দোকান হইতে কিছু ভুষি কিনিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ঘোড়াটা অল্প একটু মুখে তুলিয়াই আর খাইল না। সন্তুর বন্ধু, খোকন বলিল — চাঁদের গলা আটকে গেছে, আয় জল নিয়ে আসি। দুইজনেই জল আনিল কিন্তু একজনের ভাঁড়ের মুখ ছোটো হওয়ায় এবং অপরের মগের তলায় ছেঁদা থাকায় ঘোড়াটার আর জল খাওয়া হইল না। হাতের কাছে অন্য কোনো পাত্র না পাইয়া বালক দুইটি পাশের চায়ের দোকান হইতে একখানা ভাঙা ডিসে খানিকটা চা আনিয়া বলিল, আয় চাঁদু, খা। গোকুলের চা খুব ভালো, খেয়ে দেখ। কিন্তু গোকুলের চায়ের মাহাত্ম্য চাঁদকে মোটেই আকৃষ্ট করিল না। দু-একবার ডিস শুকিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া নিল।

ঘোড়াটা রোগা হইয়া গিয়াছে। কেমন যেন জবু-থবু ভাব। ঘায়ের অবস্থাও আগের চেয়ে খারাপ। কিন্তু যমুনার চড়ার বিরাম নাই। হৃষীকেশ তাকে কহিলেন, ঘোড়াটাকে একটু রেহাই দিও যমুনা, নইলে যে মরে যাবে। যমুনা মদ খাইয়া বুঁদ হইয়াছিল। সে আধা-হিন্দি আধা বাংলায় যাহা বলিল তার সারাংশ এই, যেখানে হাজার হাজার মানুষ মরিল সেখানে একটা সামান্য জানোয়ারের জন্য আর দুঃখ করা কেন? — বলিয়াই হাসিল, ছুরির শাণিত ফলার মতো তীক্ষ্ম ক্রূর হাসি।

সন্ধ্যার সময় ছেলেদের সাহায্যে হৃষীকেশ ঘোড়াটাকে সামনের ফাঁকা গ্যারেজে তুলিয়া দিলেন, সঙ্গে দিলেন এক বালতি জল ও কিছু বিচালি। সবেমাত্র

তাহারা বাহিরে আসিয়াছেন এমন সময় চলমান লরি হইতে শান্তিরক্ষীর দল ফুকরাইয়া গেল, ভিতরে যাও, ভিতরে যাও। পরদিন সকালে দেখা যায়, গ্যারেজে তালা লাগানো, দরজার পাশেই হৃষীকেশের বালতি, অদূরে ঘোড়াটা নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া। চোখে একটুও দীপ্তি নাই। ল্যাজ নাড়াইয়া মাছি তাড়াইবার শক্তিও নাই, মনে হয় এখনই পড়িয়া যাইবে। সন্তু তাড়াতাড়ি চারটি ছোলা আনিয়া দিল। চাঁদ তাহা মুখে তুলিল না। নন্তে বলিল, দেখিতো সন্তু, আমার হাতে খায় কি না। অনেক ঘোড়াকে আমি খাইয়েছি। জানিস্ আমাদের ঘোড়ার গাড়ি ছিল। কিন্তু এই প্রাণীটি তার এই আত্মবিশ্বাসেও আঘাত করিল। নন্তে বলিল, রোগটার সিরিয়সিটি দেখছি খুবই। শীলার মা দুঃখ করিতে লাগিলেন, আহা বেচারির দেখছি দাঁড়াবার খ্যামতা নাই। কিন্তু একবার শুইলে আর উঠবে না। শীলা জিজ্ঞাসা করে ঘোড়া নাকি দাঁড়িয়ে ঘুমোয় ? হৃষীকেশ বলিলেন, কে বললে, আটদিন বাদে ওরাও একবার গড়িয়ে নেয়।

বেলা দশটা। কড়া রোদ যেন গায়ে চাবুক মারে। চাঁদ ছটফট করে, ছেলেরা তাকে ধীরে ধীরে হাঁটাইয়া টেবুদের গাড়ি-বারান্দার তলায় লইয়া যায়। শান্ত তাদের আশ্বাস দেয়, সাদা জানোয়ার জলের রোদ সহ্য হয় না। ওতে ভয়ের কিছু নেই। এমন সময় বড়ো রাস্তার মোড়ে বেঁটে-খাটো একটি মানুষের আবির্ভাব হয়। এদিক-ওদিক চাহিয়া লোকটি গলিতে ঢোকে। একগাল পাকা গোঁফ-দাড়ি, খালি গা, পরনে ময়লা লুঙ্গি, মাথায় ফেজ, হাতে টিনের মগ। মগটা রোদে চকচক করিতেছিল। এমনিতেই সে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তার উপর এই সময় এই পাড়ায় তাহাকে দেখিয়াই সকলেই মুখ চাওয়া-চাউয়ি করিতে লাগিলেন। হৃষীকেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, এখন ও এ পাড়ায় এল কেন ? কিন্তু লোকটির কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে কী যেন খোঁজে, দীর্ঘ পথের দুই ধারে বারবার চোখ বুলাইয়া নেয়।

প্রথমে লক্ষ করে নাই, একটু পরে সাদা ঘোড়াটকে দেখিয়া তার চোখ যেন জ্বলিয়া ওঠে। দ্রুতপদে কাছে গিয়া তার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বৃদ্ধ তাদের দেশি ভাষায় বলে, আঃ সোরাব তোর এমন দশা হয়েছে!

পরিচিত এই স্পর্শে প্রাণীটি চঞ্চল হইয়া ওঠে। সেও চোখ তুলিয়া চায়। মানুষের চাহনির মতন অর্থপূর্ণ সেই দৃষ্টি অনেক কিছুই প্রকাশ করে। ভাষায় হয়তো

ততটা বলিতে পারে না। বুদো ভাঙা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করে এর নাম বুঝি সোরাব? আমরা ডাকি চাঁদ। বৃদ্ধ সহিস কহিল ওত একই হ্যায়। শান্ত জিজ্ঞাসা করিল ঘোড়াটা তোমার? না বাবু ভাড়া-গাড়ির ঘোড়া। আমি সহিস-কোচোয়ন দুইই। শান্ত বলিল, তার মানেই তোমার ঘোড়া। ঠিক হ্যায় বলিয়া বৃদ্ধ একটু হাসে। তারপর কল হইতে মগটায় জল ভরিয়া আনিয়া ঘোড়ার মুখের কাছে ধরে। জলটুকু নিঃশেষে খাইয়া ফেলিলে ছেলের দল চিৎকার করিয়া ওঠে ‘জয়হিন্দ’! সহিস লুঙ্গির ভিতরে গোঁজা একটি ঠোঙায় ছোলা আনিয়া ছিল। সেই ছোলা সে ঘোড়াটাকে হাতে করিয়া খাওয়াইল। ছোলা ফুরাইয়া গেলে, ছেলেদের বলিল, ওর চারটো চানা মিলে না বাবু? “জরুর” বলিয়া শান্ত ছুটিল। সঙ্গে ছুটিল হাবুল ও গয়ার দল। এক সঙ্গে ছোলা আসিল চার ঠোঙা। জানোয়ারটা আর একটু চাঙ্গা হইলে বৃদ্ধ বলিল, বেমার হলে সোরাব আমার হাতে ছাড়া খায় না।

তার মনে পড়িল অনেক কথা। ঘোড়াটাকে কত টাকায় কেনা হইয়াছিল। তার বয়স তখন কত, কয়টা দাঁত উঠিয়াছিল — এই সব। সোরাবের চলন দেখিয়া লোকে তাকে জিজ্ঞাসা করিত, বাজি জিতিবার এই ঘোড়াটাকে সে ঠিকা গাড়িতে জুড়িয়াছে কেন? নিজের কপালে হাত ছোঁয়াইয়া সে কহিত, নসিব। মানুষের মতো জানোয়ারেরও নসিব আছে কি না? একটু পরে সে হৃষীকেশকে প্রশ্ন করিল, কবে সব ঠান্ডা হোবে বড়োবাবু। দিন ঠিকা গাড়ি চালু হবে। রাস্তামে ডর ঔর কুছ থাকবে না। লোকটি আগের মতনই শান্তিপূর্ণ দিনগুলির কথা ভাবিতেছিল। হৃষীকেশ তার প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

হঠাৎ যেন দানবের নিন্দা ভঙ্গ হয়। অদূরে চৌরাস্তার মোড়ে সে আড়মোরা ভাঙে। ঝঞ্ঝার বেগে খবর ছুটিয়া আসে লালপট্টিতে গোলাগুলি শুরু হইয়াছে। খালের মধ্যে নদীর বেনো জলের মতন বহু লোক রাস্তার জনস্রোতের একটা অংশ হু হু করিয়া এই রাস্তায় ঢুকিয়া পড়িল। আরম্ভ হয় ছুটাছুটি, কলরব, মার মার শব্দ। বুড়া সহিস এক-একবার ছেলেদের মুখের দিকে তাকায়। সোরাবের চোখেও ফুটিয়া ওঠে অপরূপ করুণ দৃষ্টি, হয়তো সে তার পালকের বিপদ বুঝিতে পারে। নন্তে সহিসকে বলে, কিছু ভয় নেই তোমার। কিন্তু অপরিচিত শত শত হিংস্র চোখের সামনে সহিস কেমন যেন ভরসাও পায় না। কয়েকটা লোক আগাইয়া আসে। যমুনা, নন্তে, হাবুল প্রভৃতি তরুণের দল বৃদ্ধের চারধারে কর্ডন করিয়া দাঁড়ায়। হৃষীকেশ

আক্রমণকারীদের শান্ত করিবার চেষ্টা করেন। বলেন, এ একটা নিরীহ লোক, ওকে মারবেন না। জনতার মধ্য থেকে প্রতিবাদ আসে। মানুষ নেই, ও জানোয়ার আছে, এরমধ্যে মেটিয়াবুরুজ ভুলে গেলেন সবাই। টুথ ফর এ টুথ। হৃষীকেশ বলিলেন, কতো জায়গায় ওরা আমাদের বাঁচিয়েছে জানেন? আমরাও ঢের বাঁচিয়েছি। ওসব ছেঁদো কথা ছেড়ে দিন। বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা। তর্ক করা শুধু নিরর্থকই নয়, ক্ষতিকারকও বটে। তাই যমুনা ও নন্তে বলে, চুপ করুন কাকাবাবু, বলিয়া দুজনে বুক ফুলাইয়া দাঁড়ায়। যমুনা বলে, আও মারনেওয়ালা কৌন হ্যায়, আও। একটি ছোকরা চেঁচাইয়া ওঠে; আমাদের সাদা ঘোড়ার সহিসকে, আমাদের চাঁদের সহিসকে কেউ মারতে পারবে না। জনতা একটুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তারপর আবার কলরব শুরু হয়। ছেলেদের গায়ে ঢিল পড়ে। এই সময় মোড়ের চারতলার বাড়ির ছাদে একজন চিৎকার করিয়া বলে, মিলিটারি, আরম্ভ হয় দৌড়-প্রতিযোগিতা। আশে-পাশের গলি খুঁজি, খোলা দরজায়, যে যেখানে সম্ভব ঢুকিয়ে পড়ে। বৃদ্ধ সহিসকে পাঁজাকোলা করিয়া যমুনাপ্রসাদ হৃষীকেশবাবুর বাড়ির মধ্যে ছুটিয়া যায়। গুমু গুড়ুম গুম। গাড়ি হইতে নামিয়া সৈন্যরা রাজপথে টহল দেয়। তাদের জুতার শব্দ ভিন্ন সারাটা পল্লিতে আর কোনও শব্দ নাই, সে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা, দরজা জানালা বন্ধ। জানালার খড়খড়ি ফাঁক করিয়াও কেহ কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে ভরসা পায় না। সবারই মুখে অজানা উদ্বেগের ছাপ।

ঘণ্টাখানেক পরের কথা। প্রথমে বাহির হয় নন্তে ও যমুনাপ্রসাদ, পিছনে বৃদ্ধ সহিস দরজা খুলিতেই তাদের চোখে পড়ে রৌদ্রদগ্ধ রাজপথের রিক্ত রূপ, যেন মহাশ্মশান। বাঁদিকে মুখ ফিরাইয়াই তিনজনে শিহরিয়া ওঠে। একী! ঘোড়াটা পথে পড়িয়া আছে। কালো পিচের মধ্যে তার সাদা রং আরও খুলিয়াছে। দেহ পথের উপর মাথাটা ফুটপাথে। ডান কানের পাশে গোল একটা ক্ষত চিহ্ন। বৃদ্ধ সহিস ডাকিল, সোরাব সোরাব। সোরাব কোনো উত্তর করিল না। বৃদ্ধের ডাকে সোরাবের সাড়া না দেওয়া এই প্রথম।

সোরাব তখন আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। হীরক স্বচ্ছ আকাশের মতোই নির্মল দৃষ্টি। সে চাহনিতে কোনও বেদনা নাই, গ্লানি নাই। হৃষীকেশও পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ঘোড়াটার চোখের দিকে চাহিয়া তিনি একটি চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

লোডশেডিং

সত্যজিৎ রায়

(১৯২১-১৯৯২)

ফণীবাবু তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ আগে থেকেই আঁচ করলেন যে তাঁর পাড়ায় লোডশেডিং হয়ে গেছে। আজ আপিসে ওভারটাইম করে বেরুতে বেরুতে হয়ে গেছে সোয়া আটটা। ডালহৌসি থেকে বাসে তাঁর পাড়ায় পৌঁছাতে লাগে পঁয়ত্রিশ মিনিট। কতক্ষণ হল বিজলি গেছে জানার উপায় নেই, তবে একবার গেলে ঘণ্টা চারেকের আগে আসে না।

ফণীবাবু বাস থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে তাঁর বাড়ির গলি ধরলেন। এ সি, ডি সি, দুটোই গেছে। অথচ এই সেদিনও মনে হয়েছে যে অবস্থাটা যেন একটু ভালোর দিকে যাচ্ছে। নবীন চাকর কালই যখন বলল 'আরও এক ডজন মোমবাতি কিনে রাখব বাবু?' তখন ফণীবাবু বলেছিলেন, 'মোমবাতি কিনলেই দেখবি আবার লোডশেডিং শুরু হয়েছে; এখন থাক।' তার মানে বাড়িতে মোমবাতি নেই। রাস্তার আলো থাকলে তার খানিকটা তাঁর তিনতলার ঘরে ঢুকে চলাফেরার একটু সুবিধে হয়; আজ তাও হবে না। ফণীবাবু বিড়ি সিগারেট খান না, তাই সঙ্গে দেশলাইও থাকে না। অনেকদিন মনে হয়েছে একটা টর্চ রাখলে মন্দ হয় না, কিন্তু সেও করছি করব করে হয়ে ওঠেনি। বড়ো রাস্তা থেকে গলি ধরে মিনিট তিনেক গেলে পরে ফণীবাবুর বাসস্থান। সতেরোর দুই। ফুটপাথের উপর শোয়া গোটা তিনেক নেড়িকুত্তার বাচ্চাকে বাঁচিয়ে ফণীবাবু তাঁর বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

মাসখানেক হল কারবালা ট্যাংক রোড়ের বাসা ছেড়ে এইখানে এসেছেন ফণীবাবু। তিনি আর চাকর নবীন। বাড়ির প্রত্যেক তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট। সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে ফণীবাবু লক্ষ করলেন একতলায় ইস্কুল মাস্টার জ্ঞান দত্তর ঘর থেকে একটা কম্পমান হলদে আলো পড়ছে বারান্দা আর উঠানে। মোমবাতির

আলো। অন্য ফ্ল্যাটটা অন্ধকার। কোনও সাড়াশব্দও নেই। আজ পঞ্চমী। রমানাথবাবু যেন বলছিলেন পুজোয় ঘাটশিলা না মধুপুর কোথায় যাবেন। আজই চলে গেলেন না কি?

সিঁড়ির তলায় এসে 'নবীন' বলে ডাক দিলেন ফণীবাবু। কোনও উত্তর নেই। বেরিয়েছে। ঠিক লোডশেডিং-এর সময় বেরোনো চাই। এটা আগেও কয়েকবার লক্ষ করেছেন ফণীবাবু।

চাকরের আশা ছেড়ে দিয়ে সিঁড়ি উঠতে আরম্ভ করলেন ফণীবাবু। মোবাতির আলোতে প্রথম কয়েকটা ধাপ দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না, কিন্তু তার পরেই অন্ধকার। তার জন্য চিন্তার কোনও কারণ নেই; তিন চব্বিশং বাহাত্তর ধাপ তাঁকে উঠতে হবে এটা তাঁর জানা আছে। লোডশেডিং-এর আশঙ্কা করেই ফণীবাবু একদিন সিঁড়ির সংখ্যা গুনে রেখেছিলেন। তাতে অন্ধকারে ওঠার অনেকটা সুবিধা হয়।

আশ্চর্য! আলো থাকলে সিঁড়ি ওঠাটা সুস্থ লোকের পক্ষে কোনও সমস্যাই নয়; কিন্তু অন্ধকারে পনেরো ধাপ উঠে ষোলোর মাথায় রেলিং-এ কাঠের বদলে হঠাৎ কী একটা হাতে ঠেকতেই ফণীবাবু শিউরে উঠে হাতটা সরিয়ে নিলেন। তারপর মনে সাহস এনে হাতটা রাখতেই বুঝলেন সেটা একটা গামছা।

দোতলায় কোনও আলো নেই। কোনও শব্দও নেই। তার মানে কোনও লোক নেই। পশ্চিমের দুটো ঘর নিয়ে থাকেন গেস্‌টেটনার অফিসের বিজনবাবু। সঙ্গে থাকেন তাঁর স্ত্রী আর দুই ছেলে। ছোটো ছেলেটি মহা দুরন্ত। এক মুহূর্ত মুখ বন্ধ থাকে না তার। অন্য দিকে দুটি ঘর নিয়ে থাকেন কলেজ স্ট্রিটের এক জুতোর দোকানের মালিক মহাদেব মণ্ডল। ইনি সন্ধ্যায় প্রায়ই এক বন্ধুর বাড়িতে তাস খেলতে যান। বিজনবাবুরা মাঝে মাঝে সপরিবারে হিন্দি ছবি দেখতে যান; আজও হয়তো গেছেন।

ফণীবাবু এ সব নিয়ে আর চিন্তা না করে উঠে চললেন। ষাট ধাপ উঠে ডাইনে মোড় নিতেই একটা টিনের পাত্রের সঙ্গে ঠোক্করের ফলে একটা কানফাটা শব্দ তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য বেটাল করে দিয়ে তাঁর হৃৎস্পন্দনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। বাকি বারোটা ধাপ তাঁকে তাই অতি সাবধানে পা ফেলে উঠতে হল।

এবার বাঁয়ে ঘুরতে হবে। সামনে দড়িতে ঝোলানো একটা খালি পাখির খাঁচা

পড়বে। তাঁর পড়শি নরেশ বিশ্বাসকে তিনি অনেকদিন থেকে বলছেন যে ময়নাটা যখন মরেই গেছে তখন আর খালি খাঁচাটাকে পথের মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখা কেন। ভদ্রলোক এখনও পর্যন্ত কথাটা কানেই তোলেননি।

ফণীবাবু শরীরটাকে হাঞ্চব্যাকের মতো বেঁকিয়ে খাঁচা বাঁচিয়ে ডাক হাতটা বাড়িয়ে দেয়ালে ভর করে তাঁর ঘরের দিকে এগোলেন। এই ভাবে দেয়াল হাতড়ে তিন চার পা এগোলেই ডাইনে তাঁর ঘরের দরজা।

একটা গানের শব্দ আসছে। রবীন্দ্রসংগীত। বোধ হয় পাশের বাড়ির থেকে। ট্রানজিস্টারই হবে। লোডশেডিং-এর আদিম ভূতুড়ে পরিবেশে এই জাতীয় শব্দ মনে অনেকটা সাহসের সঞ্চার করে। অবিশ্যি এটাও বলা দরকার যে ফণীবাবুর ভূতের ভয় নেই মোটেই।

দরজার চৌকাঠ হাতে ঠেকতে ফণীবাবু হাঁটা থামিয়ে পকেট থেকে চাবি বার করলেন। দুটো চাবির একটা থাকে ফণীবাবুর কাছে; আরেকটা রাখে নবীন। তালার জায়গা আন্দাজ করা সহজ ব্যাপার, কিন্তু কড়া হাতড়ে ফণীবাবু তালা পেলেন না। অথচ তাঁর স্পষ্ট মনে আছে যে আপিসে যাবার সময় তিনি তালা লাগিয়ে পকেটে চাবি পুরেছেন। এটাও কি তা হলে নবীনের কীর্তি? সে কি তা হলে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে?

ফণীবাবু দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়ে বোকা বনে গেলেন; কারণ দরজা দিব্যি খুলে গেল।

'নবীন!'

কোনও উত্তর নেই। নবীন ঘুমকাতুরে নয় সেটা ফণীবাবু জানেন।

ফণীবাবু চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। অবিশ্যি 'ঘরে ঢুকলেন' কথাটা বোধহয় ঠিক হল না। কারণ দরজার পেছনে কী আছে তা বুঝতে হলে বেড়ালের চোখ দরকার। ফণীবাবু একবার চোখ বন্ধ করে আবার খুলে দেখলেন দুটো অবস্থার মধ্যে কোনও তফাত নেই। বাকি কাজ তিনি ইচ্ছে করলে চোখ বন্ধ করেই করতে পারেন। একেই বলে নিরেট অন্ধকার, যাকে দুহাত দিয়ে ঠেলে সামনে এগোতে হয়।

দরজার বাঁ পাশে এক ফালি দেয়াল, তাতে সুইচবোর্ড। তারপর দেয়াল ঘুরে গিয়ে পাশের ঘরের দরজা, আর দরজা পেরিয়ে ব্র্যাকেট আলনা। ফণীবাবু হাতে ছাতা, সেটাকে আলনায় টাঙানো দরকার। গরম লাগছে, গায়ের জামাটা খুলে সেটাও আলনায় যাবে। তবে জামা খোলার আগে বুক পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করে আলনার পরেই বাঁদিকে টেবিলের দেরাজে রাখতে হবে।

ফণীবাবু হাত বাড়ালেন সুইচ আন্দাজ করে। এখন বাতি জ্বলবে না ঠিকই, তবে বিজলি এলেই নিঃশব্দে আলো জ্বলে ওঠার মজাটা থেকে ফণীবাবু বঞ্চিত হতে চান না।

দুটো সুইচের একটার মাথা খোলা। নবীন একদিন লোডশেডিং-এর মধ্যেই হাতড়াতে গিয়ে শক খেয়েছিল। ফণীবাবু মোক্ষম আন্দাজে সেটাকে এড়িয়ে দ্বিতীয়টা বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মৃদু চাপে নীচে নামিয়ে দিলেন। খুট্ শব্দটা শুনতে ভালোই লাগল।

সুইচ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় দরজার ফাঁকটা পেরোতেই আবর দেয়াল ঠেকল হাতে। এর পরেই তাঁর মাথার সমান হাইটে —

কিন্তু না।

আলনার বদলে একটা অন্য জিনিস হাতে ঠেকল। শুধু ঠেকল না আঙুলের একটা বেআন্দাজি খোঁচা লাগায় সেটা স্থানচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

একটা ছবি। না হয় আয়না। ফণীবাবু বুঝলেন, তাঁর পায়ের উপর কাচের টুকরো এসে পড়েছে। পায়ে চটি, তাই কাচ ফোটার ভয় নেই, কিন্তু আলনাটা গেল কোথায় সে ভাবনা তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য অনড় করে দিল। তাঁর ঘরে একটা ছবি আছে বটে, পরমহংসদেবের, কিন্তু সেটা থাকবার কথা উলটোদিকের দেয়ালে। আয়নাটা থাকে টেবিলের উপর। এটা নির্ঘাত নবীনের কীর্তি। ঘরের জিনিস এখান-ওখান করার বাতিক তার আছে বটে! তাঁর চটিজোড়া তিনি রাখেন টেবিলের নীচে, আর বারণ সত্ত্বেও নবীন প্রতিদিন সেটাকে চালান দেয় খাটের তলায়।

ফণীবাবু হাতের জীর্ণ ছাতাটা মাটিতে নামিয়ে হাতলটা দেয়ালে ঠেকিয়ে

সেটাকে সাবধানে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। তারপর পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করে এগিয়ে গেলেন অদৃশ্য টেবিল লক্ষ করে। এগোবার পথে পায়ের চাপে কাচ ভাঙল — চিড় চিড় চিড়।

এবার বাঁ হাতটা টেবিলের কোণে ঠেকলেই দেরাজের হাতল খুঁজে পাওয়া সহজ ব্যাপার।

কিন্তু বাঁ হাত টেবিলে ঠেকল না। আন্দাজে ভুল হয়েছে। আরও এক পা এগিয়ে গেলেন ফণীবাবু। অন্ধকার এখনও নিরেট। রাস্তার দিকের জানলাটা খুললে হয়তো খানিকটা সুবিধে হত।

এবার বাঁ হাতটা বাধা পেল।

একটা আসবাব। কাঠের আসবাব। কিন্তু টেবিল নয়। আলমারি কি?

হ্যাঁ, এই তো হাতল। খাড়াখাড়ি হাতল। কাচের হাতল। পলকাটা। কাট-গ্লাস। যেমন অনেক পুরোনো আলমারিতে থাকে। ফণীবাবুর একটা পুরোনো আলমারি আছে বটে, কিন্তু তার হাতল কাচের কি না সেটা মনে পড়ল না।

কিন্তু এ কী — আলমারি যে খোলা!

ফণীবাবু হাতলটা ছেড়ে দিলেন। অল্প টান দিতেই দরজা খুলে এসেছে।

সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তাঁর আলমারি স্বভাবতই তিনি কখনও খোলা রেখে যান না। যদিও ধনদৌলত বলতে তাঁর কিছুই নেই, কিন্তু জামাকাপড় আছে, কিছু পুরোনো দলিল আছে, টাকা পয়সা যা কিছু থাকে আলমারির দেরাজে।

আজ সকালে কি তা হলে চাবি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন ফণীবাবু?

কিন্তু টেবিলটা গেল কোথায়? তা হলে কি —?

ঠিক। তাই হবে। কারণটা খুঁজে পেয়েছেন ফণীবাবু।

গতকাল ছিল রবিবার। দুপুরে এল তুমুল বৃষ্টি। আর তখনই ফণীবাবু দেখলেন যে তাঁর ঘরের সিলিং থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে ঘরের ভিতর। টেবিলের উপরেও জল পড়ছিল, তাই নবীন খবরের কাগজ চাপা দিয়েছিল। আসলে বাড়িটা

বেশ পুরোনো। বাড়িওয়ালাকে ছাত সারানোর কথা বলতে হবে এ কথাটা তখনই মনে হয়েছিল ফণীবাবুর। আজও যে এ পাড়ায় দুপুরের দিকে বৃষ্টি হয়েছে সেটা ফণীবাবু রাস্তা ভিজে দেখেই বুঝেছিলেন। নবীন যদি টেবিলটাকে জানালার দিকে সরিয়ে থাকে এবং কাপড়সমেত আলনাটা উলটো দিকের দেয়ালে টাঙিয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে সে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে।

ফণীবাবু মানিব্যাগটা পকেটে পুরে জানলার দিকে এগোলেন।

তিন পা এগোতেই বাধা পড়ল।

এটা চেয়ার। নবীন তা হলে চেয়ারটাকে সরিয়েছে।

না, এভাবে অন্ধকারে হাতড়ানোর কোনও মানে হয় না। তার চেয়ে বাকি সময়টা আলোর অপেক্ষায় চেয়ারটাতেই বসে কাটিয়ে দেওয়া ভালো।

ফণীবাবু বসলেন। হাতলওয়ালা চেয়ার, বসার জায়গাটা বেতের। একবার যেন মনে হল তাঁর নিজের ঘরের চেয়ারে হাতল নেই, কিন্তু পরমুহূর্তেই খটকাটা মন থেকে দূর করে দিলেন। মানুষ নিজের ঘরের আসবাবের খুঁটিনাটি সব সময় মনে রাখে না, এই অভিজ্ঞতা তাঁর আজকে হয়েছে।

এখন ফণীবাবুর মুখ দরজার দিকে। বাইরে ছোটো ছাতটার ওদিকে একটা ফিকে চতুষ্কোণ আভা। ফণীবাবু বুঝলেন সেটা আকাশ। শহরের যে অংশে লোডশেডিং নেই সেখানকার আলো প্রতিফলিত হয়ে আকাশে পড়েছে। যদিও মেঘ থাকায় তারা দেখা যাচ্ছে না। যাক,তবুও তো একটা দেখার জিনিস রয়েছে চোখের সামনে।

একটা টিক টিক শব্দ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যে মুহূর্তে ফণীবাবুর খেয়াল হল যে তাঁর ঘরে কোনও টেবিল ঘড়ি নেই, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কান-ফাটা শব্দ তাঁকে চমকিয়ে প্রায় চেয়ার থেকে ফেলে দিল।

টেলিফোন।

তাঁর মাথার ঠিক পিছনে টেবিলের উপর টেলিফোন বেজে উঠেছে।

নিঃশব্দ অন্ধকারে প্রায় এক মিনিট ধরে একটা তুমুল আলোড়ন তুলে অবশেষে টেলিফোনটা থামল।

এইবার ফণীবাবু বুঝলেন যে তিনি তাঁর নিজের ঘরে আসেননি, কারণ তাঁর টেলিফোন নেই। আর এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কাছে আসল ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

সতেরোর দুই আর সতেরোর তিন হল পাশাপাশি বাড়ি। একই ধাঁচের দুটো বাড়ি। দুটো বাড়িই তিনতলা, দুটো বাড়িরই একই বাড়িওয়ালা। সতেরোর তিনে ফণীবাবু কোনও দিন ঢোকেননি, কিন্তু আজ বোঝাই যাচ্ছে যে দুটো বাড়ির প্ল্যানই প্রায় হুবহু এক। তিনি এখন বসে আছেন সতেরোর তিনের তিন তলার পশ্চিমের ঘরে। সেই ঘরের আলো এখন নেই, কিন্তু ঘরের দরজা খোলা, আলমারি খোলা।

তার মানে যাই হোক না কেন, ফণীবাবু নিজের ভুল বুঝতে পেরে আর সময় নষ্ট না করে উঠে পড়ার উপক্রম করেই আবার তৎক্ষণাৎ বসে পড়লেন।

আরেকটা শব্দ। এটা এসেছে তাঁর খুব কাছেই বাঁ দিক থেকে।

মেঝের উপর একটা টিনের বাক্স জাতীয় কিছু ঘষটানোর শব্দ।

ফণীবাবু বুঝলেন যে তাঁর গলা শুকিয়ে আসছে আর তাঁর বুকের ভিতরে দুরমুশ পেটা শুরু হয়েছে।

চোর।

তাঁর পাশেই বোধহয় খাট, আর খাটের নীচে চোর। বেরোবার চেষ্টায় খাটের নীচে রাখা টিনের বাক্সে ধাক্কা খেয়েছে।

ঘরের দরজা আর আলমারি কেন খোলা সেটা এখন খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

চোরের কাছে যদি হাতিয়ার থাকে তা হলে ফণীবাবুর অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। তাঁর নিজের একমাত্র হাতিয়ার ছাতাটি এখন নাগালের বাইরে। তা ছাড়া ছাতার যা দৈন্যদশা, তাতে চোরের চেয়ে ছাতাটি জখম হবে বেশি।

চোর অবিশ্যি আবার চুপ মেরে গেছে, কারণ টিনের বাক্সের শব্দ তুলে নিজের উপস্থিতিটা জানান দেবার অভিপ্রায় তার নিশ্চয়ই ছিল না, ফলে সে হয়তো কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট।

'ঠিক ঠিক ঠিক!' — একটা টিকটিকি ডেকে উঠল।

ভুল ভুল ভুল! —ফণীবাবুর মন বলল। একটা বিশ্রী ভুল করে একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছেন তিনি। ছিঁচকে চোরের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকার সম্ভাবনা কম, তবে ছোরা ছুরি থাকা অসম্ভব নয়। অবিশ্যি অনেক চোর নিরস্ত্র অবস্থাতেই বেরোয়। হাতাহাতির প্রশ্ন হলে ফণীবাবু হয়তো লড়ে যাবেন, কারণ এককালে তিনি ফুটবল খেলেছেন পাড়ার টিমে। কিন্তু মুশকিল করেছে এই অন্ধকার। দৃষ্টির অভাবে অতি শক্তিশালী মানুষও অসহায় বোধ করে।

কিন্তু তা হলে কী করা যায়। যা থাকে কপালে বলে উঠে পড়বেন কি?

কিন্তু যদি সিঁড়ি নামার মুখে বিজলি এসে যায়? আর ঠিক সেই সময় যদি একদিক দিয়ে চোর পালায়, আর অন্যদিক দিয়ে ঘরের মালিক এসে পড়েন? আর মালিক যদি এসে দেখেন তাঁর ঘরে চুরি হয়েছে, তাহলে তো —

ফণীবাবুর চিন্তায় ছেদ পড়ল।

নীচ থেকে একটা পায়ের শব্দ আসছে।

এই সিঁড়ি ওঠা শুরু হল। ধীরে ধীরে উঠছেন ভদ্রলোক। ওঠার মেজাজ আর পায়ের শব্দ থেকে পুরুষ বলে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আটচল্লিশ ধাপ অবধি গুনে উনপঞ্চাশের মাথায় ফণীবাবুর ধারণা বদ্ধমূল হল যে, এই ঘরের মালিকই আসছেন সিঁড়ি উঠে, আর সেই সঙ্গে হঠাৎ ভেলকির মতো মনে পড়ে গেল —

এই ঘরের মালিককে তো ফণীবাবু চেনেন!

এতক্ষণ খেয়াল হয়নি কেন? শেয়ারের ট্যাক্সিতে একবার ডালহৌসি অবধি গিয়েছিলেন ভদ্রলোকের সঙ্গে। কোনও কারণে বাস বন্ধ ছিল সেদিন। ভদ্রলোক নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। নাম আদিনাথ সান্যাল। বছর পঞ্চাশেক বয়স, জাঁদরেল চেহারা, টকটকে রং, গায়ে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি। ঘন ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ সবজেটে চোখ।

বাষট্টি-তেষট্টি-চৌষট্টি .... পায়ের শব্দ এখন জোরালো।

ঘরের ভিতরেও শব্দ। খচমচ ধুপধাপ — আর তারপরেই একটা যন্ত্রণাসূচক 'উফ'। পায় কাচ বিঁধেছে। চোরের শাস্তি। বাইরে আকাশের ফিকে আলোটা এক মুহূর্তের জন্য ঢেকে গিয়ে আবার দেখা গেল। চোর ঘুরেছে ডান দিকে। পাইপটা বেয়ে নামা ছাড়া আর গতি নেই তার।

সিঁড়ির পায়ের শব্দ এবার মেঝেতে। বাইরের বারন্দায়। ফণীবাবুও উঠে পড়লেন। সাবধানে কাচ বাঁচিয়ে ছাতাটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

দরজার মুখ অবধি এসে পায়ের শব্দ থামল চৌকাঠের বাইরে। কয়েক মুহূর্তের নিঃশব্দতা। তারপর —

'এ কী! দরজাটা — ?'

আদিনাথ সান্যালের বাজখাঁই কণ্ঠস্বর। অনেক গল্প করেছিলেন সেদিন ট্যাক্সিতে, তাই ফণীবাবু গলাটা ভোলেননি।

আরও মনে পড়ছে ফণীবাবুর। তাঁর পাশের ঘরের নরেন বিশ্বাস বলেছিলেন একটা কথা। সান্যাল মশাই নাকি অগাধ টাকার মালিক। কলকাতায় তিনখানা বাড়ি। সব ভাড়া দিয়ে নিজে এইখানে থাকেন। উপার্জনের রাস্তাগুলো না কি সিধে নয়। আলমারিতে না কি অনেক কালো টাকা।

সান্যাল মশাই এখন ঘরের ভিতর। কাচ ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলেছেন হাতে হাতে চোর ধরার আশায়। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে ভদ্রলোকের।

ফণীবাবুর আর ভয় নেই। আদিনাথ সান্যালের পিছন দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে বাহাত্তরটা সিঁড়ি নেমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে সতেরোর দুইয়ের দিকে রওনা দিলেন।

নিজের বাড়ির তিন তলায় এসে খালি পাখির খাঁচাটা বাঁচিয়ে একবার এগোতেই যখন বিজলি ফিরে এল, তখন ফণীবাবু লক্ষ করলেন যে তাঁর হাতে একটা ঝকঝকে নতুন হাল ফ্যাশানের জাপানি ছাতা এসে গেছে।

হিজল খালের কান্না

বিমল চৌধুরী

(১৯২২-২০০১)

দেখ্‌খো বাচ্চো লন্ডন দেখ্‌খো ... ভারী শ্যহর পারিশ দেখ্‌খো ...দিল্‌হি দেখ্‌খো বুম্বাই দেখ্‌খো ... আগ্রা কী তাজমহল দেখ্‌খো ... আয়ো বাচ্চো জল্‌দি আয়ো ... রংদার এ দুনিয়া। দেখ্‌খো ... ঝুম্ ঝুম্ ঝুমা ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুমা ...

নূপুর বাঁধা পায়ে রাস্তায় তাল ঠুকে, মাঝে মাঝে কিছুটা বিরতি নিয়ে উঁচু গলায় সুর তুলে কথাগুলো আউরে যাচ্ছে লোকটি। মাথায় বহু রৌদ্র-বৃষ্টির ছোপধরা এককালের জমকালো বিরাট পাগড়ি, দু-কানে দোলান দুটি তামার রিং, চোখে পড়ার মতো সুপুষ্ট গোঁফ, কাঁধের বিবর্ণ গামছায় সারাদিনের রৌদ্র-ক্লান্তির ঘাম মুছে শুকনো মুখে খইনি উদ্‌গিরিত লালা থুক থুক করে ফেলে দেহাতি লোকটি হিন্দুস্থানি বাংলায় এক নাগাড়ে কথাগুলো আউরে চলেছে।

ওর সামনে কোমর সমান উঁচুতে পায়ার ওপর একটা বড়ো বেলুনের মতো পলকাটা কাঠের বাক্স, তার চারদিকে কাচ লাগানো ছোটো ছোটো গোলাকার গর্ত। পাঁচ পয়সা নজরানা নিয়ে লোকটি ম্যাগনিফ্লাইং গ্লাসের মায়া জাদুতে উৎসুক কৌতূহলী শিশু-কিশোরদের, বড়ো বড়ো শহর পথঘাট প্রাসাদ রাজারানি সমুদ্র ইত্যাদির স্টিল পিকচার নেড়েচেড়ে দেখাচ্ছে আর হাঁক দিচ্ছে একটানা।

দুপুর গড়িয়ে শীতের বিষণ্ণ বিকেল। লোকটির পেছনে আগরতলার শিশু-উদ্যানে প্রজাতন্ত্রী মাসের সাজানো ইন্দ্রপুরী। উন্নয়ন পরিকল্পনার কাগুজে প্রাসাদে প্রাসাদে পথে জলাশয়ে অসময়ে বর্ণালি বিদ্যুতের সমারোহ। উত্তরে, হতমান রং জ্বলে যাওয়া উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ চুড়োয় পড়ন্ত সূর্যের শেষ রক্তিম আভা।

শিশু-উদ্যানে সাজানো উন্নয়ন-ইন্দ্রপুরীর বাইরে পথের ধারে লোকটি ভাব দীন আয়োজন নিয়ে উঁচু গলায় হিন্দি-বাংলায় হেঁকে চলেছে। পথ চলতি শিশু কিশোরেরা ওর বাক্সের চারধারে কৌতূহলী ভিড় জমিয়েছে, দু-একজন করে দক্ষিণা দিয়ে ফোঁকরে চোখ রাখছে, লোকটি তখন উৎসাহিত হয়ে — লন্ডন দেখ্খো ... পারিশ দেখ্খো রংদার এ দুনিয়া দেখ্খো ... সুর ধরে ওদের মনে রং ধরাবার চেষ্টা করছে।

পথের উলটোদিকে ইতিহাস হয়ে যাওয়া রাজার, রাজ্যাভিষেকের সুউচ্চ স্মারক মণ্ডব। মণ্ডবের নীচে পথের ধারে দুর্বোঘাসে পোঁটলা-পুঁটলি, কাঁথা-বালিশ, হাঁড়ি-কড়াই, শিশু-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, একপাল মানুষ গাদাগাদি হয়ে বসে। জিনিস-পত্র মেয়ে মদ্দ ছেলে বুড়ো সব একাকার। যেন কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই — প্রাণহীন জড়পিণ্ড অথবা বিবর্তন সংঘাতে রূপান্তরিত আধুনিক সভ্য নয়, — যেন আদিকালের আদিম মানুষ। অসভ্য পৃথিবীর ভয়াল কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা গোষ্ঠীর সংঘর্ষে বিতাড়িত একদল ভয়ার্ত ছুটছে ... প্রাণপণে উর্ধ্বশ্বাসে সম্মুখ দিকে ছুটে ছুটে তাৎক্ষণিক বিপদ থেকে ত্রাণ পেয়ে অন্য এক দেশে, অন্য এক ভূমে দুর্বোঘাসে এসে শ্বাস ফেলে, সুদূর পথশ্রমের লালা-ক্লান্তি-স্বেদ মুছে ফেলছে। এরপর ! তারপর কী, এখনও ওরা ভাবতে পারছে না। দিনের সূর্য ডুবছে। রাতের আঁধার নামছে। আঁধার আরও নামুক। অন্ধকার আরও গাঢ়তর হোক, তখন ওরা গাদাগাদি করে পরস্পরের গা ঘেঁষে অন্ধকারকে চোখ বুজে ঠেকিয়ে রেখে ভাবতে শুরু করবে ... এই অচেনা ভূমিতে আমরা এখন কী করব ... এই অন্ধকারে কোথায় যাব !

আট-ন বছরের একটি রোগা ছেলে সেই গাদাগাদি ভিড় থেকে একটু সরে এসে, পথের এপারে জাদুকরি বাক্সওয়ালার দিকে বড়ো বড়ো চোখ মেলে অপলক তাকিয়েছিল। পেছনে সাজানো ইন্দ্রপুরী, পাশে রাজপ্রাসাদের সিংহ দরজা, চারদিকে শিশু-কিশোরের ভিড়ে বিরাট পাগড়ি মাথায় লোকটির ওর কাছে এক অপরূপ রূপকথার জাদুকর যেন। লোকটির দুর্বোধ্য সুরেলা কথাগুলো ছেলেটির কাছে ক্রমশ গভীর অর্থবহ হয়ে ওঠে, আও খোকি আও খোকা ... যাহা চাইবো তাহা মিলবো ... ভারী জবর শ্যহর দেখবো ... আয়ো জলদি ...

ভীরু চোখে ছেলেটি চারদিক দেখছিল। একদিকে বিশাল, রাজপুরী সিংহ

দরজায় বন্দুকধারী সেপাই। সেখান থেকে পথ নেমে এসেছে তিনদিকে। একটি পথ ওদের পাশ দিয়ে সোজা চলে গেছে বিরাট একটা গম্বুজের তলা দিয়ে। সেখানে দু-পাশে সারি সারি দালান, পথে লোকজন নানা ধরনের গাড়ি ব্যস্ত গোলমাল, এখান থেকে সে একটা অবিচ্ছিন্ন স্রোতের মতো প্রবহমান দেখতে পাচ্ছে।

এদিকে চোখের সম্মুখে রংদার ইন্দ্রপুরীতে রং-বেরংয়ের পোশাক পরা ওরই সমবয়সি ছেলে মেয়ের দল লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলা করছে, মই বেয়ে উঠে সাঁই করে পিছলে নামছে ... আনন্দ হাসি হই হুল্লোড়। দরজার পাশে বাঁশের তৈরি লম্বা ঘরে বাজনা বাজছে। দেখে যাও পুতুল নাচ — পেল্লায় লম্বা টুপি পরা একটি লোক হেঁকে চলেছে — এই চলে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে বোম্বাই পুতুল নাচ।

শ্যামল কিশোরটি অবাক দৃষ্টিতে সব কিছু দ্যাখে। আবার তাকায় সেই জাদুকরি বাক্সের দিকে, জাদুকরের উঁচু গলা শোনা যাচ্ছে, আও খোকা আও খোকি ... যাহা চাইব তাহা মিলি ... ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ...

ছেলেটি একমনে কথাগুলো শোনে, ওর চোখ চক চক করে ওঠে, একসময় সে গুটি গুটি এগোয়। দ্রুত ধাবমান কয়েকটা মোটর, রিকশা, সাইকেল পার হতে দিয়ে সে সন্তর্পণে রাস্তা পার হয়ে ক্রমশ জাদুকরি বাক্সের দিকে এগিয়ে যায়। উত্তেজনায় ওর ছোট্ট দেহটা কাঁপতে থাকে, বুক উথাল, লোভাতুর দু-চোখ চিকচিক করতে থাকে। সে এক পা দু-পা করে বাক্সের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। লোকটির দৃষ্টি পড়ে ওর দিকে, আগ্রহী গলায় জিজ্ঞেস করে — দ্যাখ্ লাও খোকা, যা চাও সব কুছ্ দেখতে পারবে ... লাও পাঁচ পয়সা।

ছেলেটি কাঁপা হাতে একটি পাঁচ পয়সা এগিয়ে ধরে। পয়সা হাতে নিয়ে লোকটি বলে ওঠে, — আরে রামজি, এহিতো পাকিস্তানকে পয়সা আছে, ইয়েতো নহি চলি ... ইয়ে পয়সা চলবে না খোকা।

ছেলেটি ঢোঁক গেলে, — আমার অন্য পয়সা নাই ... আমারে তুমি খালি নিশ্চিন্তপুর দ্যাহাও, আর কিছু দ্যাহান লাগবো না।

— রাজা দেখ্‌খো রানি দেখ্‌খো... ভারী শ্যহর লন্ডন দেখ্‌খো — লোকটি হাঁকে।

— নাহ্-না আমি খালি আমাগো নিশ্চিন্তপুর দেখবার চাই।

— ক্যেয়া, লোকটি কান নীচু করে — নিশ্চিহ্নপুর! হেসে ওঠে লোকটি, আরে ক্যেয়া বোল্‌তা নিশ্চিন্‌পুর, ওহ ক্যেয়া চিজ হ্যায় ...হাঃ হাঃ হাঃ। লোকটি মুখ ব্যাদান করে প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে।

সেই মুখের অতল গহ্বরে ছেলেটির নিশ্চিন্তপুর হিজল খালের পারে দাওয়া ঘেরা দুটি পর্ণ কুটির কাজলি গাই পুষি বেড়াল করমচা কামরাঙা সিঁদুরে আম গাছ, স-ব-কি-ছু নিমেষে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আলোয় ফুলঝুরি ছড়ানো জমকালো ইন্দ্রপুরী, উজ্জয়ন্ত রাজ প্রাসাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছেলেটি এতক্ষণে ডুঁকরে কেঁদে ওঠে।

বাগ্‌ধারা (নির্বাচিত ৬০-টি)

- অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া
- অরণ্যে রোদন
- অহি-নকুল সম্পর্ক
- আঁতে ঘা দেওয়া
- আকাশ কুসুম
- আষাঢ়ে গল্প
- ইঁচড়ে পাকা
- ইন্দ্রপতন
- উত্তম-মধ্যম
- উলুবনে মুক্তো ছড়ানো
- একাই একশো
- একাদশে বৃহস্পতি
- ওজন বুঝে চলা
- কই মাছের প্রাণ
- কেঁচে গণ্ডুষ
- কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোনো
- খয়ের খাঁ
- খাল কেটে কুমির আনা
- গভীর জলের মাছ
- গোবরে পদ্মফুল
- ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া
- চাঁদের হাট
- চোখে সর্ষেফুল দেখা
- ছড়ি ঘোরানো
- ছেলের হাতের মোয়া
- জগাখিচুড়ি
- জলে কুমির ডাঙায় বাঘ
- টনক নড়া
- টাকার কুমির
- ঠোঁট কাটা
- ডিগবাজি খাওয়া
- ডুমুরের ফুল
- তাসের ঘর
- তিলকে তাল করা
- তীর্থের কাক
- দক্ষযজ্ঞ
- দু-নৌকায় পা দেওয়া
- ধনুক ভাঙা পণ
- ধান ভানতে শিবের গীত
- ননীর পুতুল
- নয়ছয়
- নুন আনতে পান্তা ফুরোয়
- পাকা ধানে মই
- পুকুর চুরি
- বক ধার্মিক
- বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়
- বালির বাঁধ
- বিনা মেঘে বজ্রাঘাত
- ভস্মে ঘি ঢালা
- মিছরির ছুরি
- মেঘ না চাইতে জল
- যখের ধন
- রথ দেখা কলা বেচা
- শাঁখের করাত
- শাক দিয়ে মাছ ঢাকা
- শিরে সংক্রান্তি
- সবে ধন নীলমণি
- সুখের পায়রা
- হাটে হাঁড়ি ভাঙা
- হাতের পাঁচ।